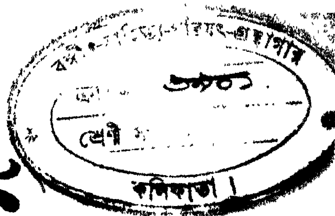


শান্তি

গার্হস্থ্য চিত্র।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

———:•:———

কলিকাতা,

১০০ নং আপার চিৎপুর রোডস্থিত "রামময় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
হইতে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

———

সন ১৩২২ সাল।

মূল্য ।৵০ দশ আনা মাত্র।



সোদরপ্রতিম সুহৃদ্‌বর

শ্রীযুত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই ক্ষুদ্র

স্নেহোপহার

সাদরে

অর্পিত হইল।

নিবেদন।



পুণ্যের জয়, পাপের শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন করাই, "গতি"র মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজদ্রোহীর পরিণাম কিরূপ ভীষণ, ভৈরবের চরিত্র পাঠে তাহা উপলব্ধি হইবে। যাহাতে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ শিষ্ট, শান্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ হন, ভৈরব,অঞ্জনাকুমার প্রভৃতির চরিত্রাঙ্কনের তাহাই লক্ষ্যস্থল। উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে, পাঠকবৃন্দই স্থির করিবেন।

নরনারী লইয়াই মনুষ্যসমাজ যে সমাজে আদর্শচরিত্রা রমণী বিরল, সেই সমাজে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু মহিলার পাতিব্রাত্য, লোকহিতৈষণা, ধর্ম্মপরায়ণতা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎপ্রদর্শনার্থ রমা, সাবিত্রী লীলাবতীর সৃষ্টি। জানি না, ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না। "গতি" পাঠে যদি একটীও উচ্ছৃঙ্খল যুবকের মতি পরিবর্ত্তিত হয়, যদি একটীও বালিকার চরিত্র গঠনের সুবিধা হয়, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক হইল।

কলিকাতা,
৬।২ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গলি,
৫ই আশ্বিন ১৩২২ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

গীতি

সান্ধ্যরাগরঞ্জিত গগন-প্রান্ত হইতে অপূর্ব্ব শোভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তরুশিরে, সরোবর-বক্ষে এখনও দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। ধীর সমীর থাকিয়া থাকিয়া, সৌরভভার মস্তকে লইয়া, কাহার উদ্দেশে কোথায় যেন উধাও হইয়া যাইতেছিল। প্রান্তরে এখনও ঝিল্লিরব প্রবলবেগে উত্থিত হয় নাই। এখনও শাখিশিরস্থ বিহঙ্গমকুলের কলরবে দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। দূরে—অতি দূরে—ক্বচিৎ গোপালের খুরোত্থিত ধূলিপটলে ব্যোমমার্গ আচ্ছন্ন হইতেছিল।

মাঠে লোক নাই। গ্রামে কোন কোন গৃহে দীপালোক পরিদৃষ্ট হইতে-ছিল। দূরাগত শঙ্খধ্বনি এখনও দিগন্তে বিলীন হয় নাই। ধূসরবর্ণ সন্ধ্যাদেবী তমিস্রা রজনীর অগ্রদূতীর ন্যায় বিমান হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতেছিলেন। এমন সময়ে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যস্থ দীর্ঘিকার সোপানে বসিয়া একটী অপরূপ যুবতী যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দৃষ্টি মধুরভাব্যঞ্জক হইলেও চাঞ্চল্যশূন্য নহে। এই নির্জ্জন প্রান্তরে, রজনীসমাগমের প্রাক্কালে, তাল-নারিকেল-গুবাক-তিন্তিড়ীবৃক্ষ-সমাবৃত উচ্চ পাহাড়বেষ্টিত পুষ্করিণীর তীরে, একাকিনী অবস্থান—স্ত্রীলোকের পক্ষে ত দূরের কথা—সাহসী পুরুষের পক্ষেও সুকঠিন। বিশেষতঃ প্রবল জনশ্রুতি

যে,উক্ত বাপী-সান্নিধ্যে প্রেতিনীর বাস আছে। এমন কি, অনেকে নিশাযোগে বৃক্ষমূলে শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা, দীর্ঘাকায়া প্রেতিনী সন্দর্শনও করিয়াছে। প্রেতিনীর গতি বিচিত্র, ব্যবহার অদ্ভুত। গ্রামের কতিপয় দুঃসাহসিক ব্যক্তি একবার প্রেতিনীকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে অদৃশ্য হইল। কিংবদন্তী যে, প্রেতিনী কখন ভীষণ বদন ব্যাদনপূর্ব্বক গ্রাস করিতে সমুদ্যত হয়, কখন পশ্বাবয়ব ধারণ করে, আবার কখন পরম রূপসী পূর্ণ যুবতী হইয়া অট্টহাস্যে দিগন্ত মথিত করে। যাহারা ধরিতে গিয়াছিল, তাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাংঘাতিক পীড়ায় পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছিল। তদবধি আর কেহ সাহসপূর্ব্বক প্রেতিনী ধরিতে যায় নাই। প্রেতিনী রাত্রিতে পুষ্করিণীর কাল জল লইয়া ক্রীড়া করে, বৃক্ষের পাতায় পাতায় লাফাইয়া বেড়ায়, প্রান্তরে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করে, আর সুবিধা পাইলে পথিকের ঘাড় মটকাইয়া দেয়। সুতরাং প্রেতিনীর অস্তিত্বে কাহারও সংশয় নাই।

সংস্কার লইয়াই সংসার—তা সু-ই হউক, আর কু-ই হউক। গ্রামবাসীরা সংস্কারবশতঃ সন্ধ্যার পর আর উক্ত পুষ্করিণীর সন্নিকটে যাইত না। এই প্রেতিনীর আবাসভূমি তড়াগ-তটে আজি কিন্তু রমণী একাকিনী!

ভামিনীর নাম রমা। বয়স আনুমানিক বিংশতি বৎসর, পূর্ণ যৌবন—যেন ভাদ্রমাসের ভরা নদী—দুকুলপ্লাবী। নিখর, নিটোল গঠন। অপরূপ অবয়ব। বর্ণ চম্পকবিনিন্দিত।

প্রবাদ, রমা ধীবরকন্যা। ত্রিকুলে কেহ নাই, গ্রামপ্রান্তে এক পর্ণকুটীরে বাস। তাহার দেহে অসীম বল, হৃদয়ে অফুরন্ত সাহস। তাহার দেবীসদৃশী কায়া, তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আস্য দেখিলে পাষণ্ডেরও পরিহাস করিবার সাহস হয় না।

রমার গতিবিধি বিচিত্র। সে ধীবরের ব্যবসায় করে না, হাটে বাজারে

যায় না, অথচ দুঃখেই হউক আর সুখেই হউক, দিন কাটিয়া যায়। কেহ কখন তাহাকে কাহারও দ্বারে হাত পাতিতে দেখে নাই।

রমার কি করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, কেহ তাহা বলিতে পারে না। সে কখন্ কোথায় যায়, কি করে, কেহ নির্ণয় করিতে পারে না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। অসংখ্য তারকাসমাকীর্ণ নভোমণ্ডল প্রকৃতির হীরকখচিত বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ধরণীবক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। তথাপি রমা একাকিনী নিভয়ে পুষ্করিণীর পাড়ে অবস্থান করিতে লাগিল। কেবল তাহার আগ্রহ, উদ্বেগের মাত্রা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল।

এমন সময়ে বৃক্ষান্তরাল হইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তি বহির্গত হইল। সহসা এই জনহীন স্থানে মনুষ্য-সমাগমে অতিবড় সাহসীরও ভয়ের সঞ্চার হওয়া সম্ভব, কিন্তু রমার তাহা হইল না। সে যাহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল—সে আসিল।

আগন্তুককে দেখিয়া তাহার হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে নাচিয়া উঠিল, শরীর-মধ্যে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল। আশা-উৎফুল্ল নয়নে আগন্তুকের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে সে সোপানাবলী আরোহণ করিতে লাগিল। মনুষ্যমূর্ত্তিও অতি সন্তর্পণে, বিশেষ সতর্ক ভাবে, চকিতনেত্রে রমার নিকট উপস্থিত হইল।

বহুদিনের অপহৃত রত্ন অকস্মাৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইলে—বহুকাল পরে প্রিয়জন সমাগমে—যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, রমারও তাহাই হইল। সে বাহুপাশে আগন্তুকের গলদেশ বেষ্টন করিয়া নির্নিমেষলোচনে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টির অর্থ—সে নির্ব্বাক্ ভাষার মর্ম্ম—বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুভব করা সহজ। রমা তখন আত্মহারা।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অবস্থানের পর আগন্তুক বলিল, "রমা, সোহাগের এ সময় নহে। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আমি না আসিলে তুমি বড় কষ্ট পাও, তাই মাঝে মাঝে এক একবার দেখা দিতে আসি।"

রমা বলিল, "তোমার যে আসিতে খুব কষ্ট হয়, অনেক ক্ষতি হয়, আশঙ্কা উদ্বেগ অনেক বাড়ে, তা আমি জানি। তোমাকে বহুদিন না দেখ্‌তে পেলে বুকের ভিতর কেমন করতে থাকে, তাই আস্‌তে বলি। যদি একান্তই অসুবিধা হয়, আর এস না। আমার কপালে যা থাকে হ'বে। তোমার মূর্ত্তি ত আমার হৃদয় থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"

আ। রমা! বহুবার ত বলেছি, তোমাকে দেখবার জন্য আমারও প্রাণটা ব্যাকুল হয়, তাই আসি। কিন্তু আজিকার আসা—কেবল ভালবাসার খাতিরে নহে—প্রাণের টানে নহে—অন্য কার্য্যব্যপদেশে।

রমা। কাজটা কি?

আ। তা এখন ব'লবো না, যথাসময়ে জান্‌তে পারবে। আমার একটা কথা রাখ্‌বে কি?

রমা। আরাধ্য দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নাই।

আ। তোমার কাছে যে এই কথাই শুনবো, তা' জান্‌তাম্।

র। কথাটি এখন বল?

আ। একজনকে তোমার নিকট পাঠাব। কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে তোমার কুটীরে লুকিয়ে রাখ্‌তে হ'বে।

র। কুটীরে আমি যে একাকিনী থাকি। অন্য পুরুষ কিরূপে স্থান পাবে?

রমার বাক্যাবসান হইতে না হইতে আগন্তুকের ভাবান্তর ঘটিল, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিগোলকবৎ ঘূর্ণায়মান হইল। বলিল "এই না ব'লছিলে, আমি তোমার আরাধ্য দেবতা? তোমার মুখ ও মন এক হ'লে কখনই এরূপ অসম্মতি প্রকাশ ক'রতে পারতে না।"

রমা কাতরকণ্ঠে বলিল, "রাগ করিও না। কেন আপত্তি করছি, বুঝিয়া দেখ। যদি কেউ অন্য পুরুষকে আমার কুটীরে প্রবেশ করতে অথবা কুটীর হ'তে বেরুতে দেখে, তা হলে কি মনে করবে? ভাববে না কি, রমা অসতী?

তখন শতমুখে নিন্দা প্রচারিত হ'বে, কলঙ্কিনী বলে কেউ আমাকে বাড়ীতে পর্য্যন্ত ঢুকতে দেবে না। কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে কেমন ক'রে বাঁচবো ?"

আ। কলঙ্ক ? নিন্দা ? এসকল কথা আমার কাছে বলো না রমা। লোক বা সমাজ আমার কোন্ উপকার করেছে ? লোকে আমার শত্রু,আমি লোকের শত্রু ! সেই সে লোক কি আমা অপেক্ষা তোমার নিকট বড় হল ? রমা, লোকনিন্দা, সমাজলাঞ্ছনার ভয় কি ভালবাসা অপেক্ষা অধিক ?

র। নিশ্চয়ই নয়। তবে যতক্ষণ লোকালয়ে মানুষের সংশ্রবে থাকতে হয়, ততক্ষণ উহা অপরিত্যাজ্য। তুমি প্রভু আমি দাসী, তুমি গুরু আমি শিষ্যা, তুমি দেবতা আমি সেবিকা। সুতরাং তোমার কথার উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। তবে মনে হয়, অনেক সময়ে আমরা স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করি, আর দোষ দিই সমাজের বা ভগবানের।

আ। রমা, বাক্‌যুদ্ধ বা তর্ক করিতে আসি নাই। শাস্ত্রালোচনা বা সমাজতত্ত্বের মীমাংসার স্থান ও সময় ইহা নহে। সুতরাং তোমার কথার উত্তর দিব না। এখন জিজ্ঞাস্য, আমার কথা শুনবে কি না বল ?

র। তোমার পায়ে পড়ি, সকল দিক বিবেচনা করে আদেশ কর।

আ। তবে এই শেষ, তোমাতে আমাতে আর দেখা হবে না।

র। আমার অবস্থাটা কি একবার ভাবা উচিত নয় ?

আ। অবস্থা ?—অবস্থা ? অবস্থার কথা কি বলচো রমা ? আমার কি অবস্থা ছিল, কি হয়েছে ? তোমার কি অবস্থা ছিল, কি হয়েছে ? দেশের কি অবস্থা ছিল, কি হয়েছে ? লোকচরিত্রের কি অবস্থা ছিল, কি হয়েছে ? সেই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্যই ত এই ভীষণ সংসার-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছি। তুমি আমায় ভালবাসিলে সাহায্য করতে বাধ্য। তাই তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। যদি ভালবাসা ভুলতে চাও, প্রতিশ্রুতি ভুলতে চাও, শিক্ষা দীক্ষা ভুলতে চাও, কর্ত্তব্য ভুলতে চাও, তা' হলে তোমার আমার কোন

প্রয়োজন নাই। যাও রমা, অদূরে তোমার কুটীরে যাও—তোমার ধর্ম্ম—তোমার কুটীরের পবিত্রতা রক্ষা করগে। আর যে সমাজ বা লোকে আমাদের নিরন্তর নিষ্পেষণ করেছে ও করছে, সেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর সমাজের পদতলে লুণ্ঠিত হ'য়ে ধন্য হওগে। আমি চির বিদায় লইলাম।

রমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইল। সে কাঁদিয়া আকুল হইল। ভূলুণ্ঠিতা হইয়া আগন্তুকের পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া সরোদনে বলিল, "তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার সমাজ, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! দাসীকে—সেবিকাকে—কেমন করে ত্যাগ করবে?"

তখন আগন্তুকের চক্ষেও জল দেখা দিল। শশব্যস্তে রমাকে বক্ষে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিল। আগন্তুকের এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু রমার কপোলদেশে পতিত হইল। রমা ভাবিল—ইহাই তাহার স্বর্গ।

(২)

নিবিড় বন। বৃক্ষাবলী ঘন সন্নিবিষ্ট। গাছের মাথায় মাথায়, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় মিলিয়াছে। অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী বহুদূর ব্যাপিয়া চলিয়াছে। কোথায় শেষ হইয়াছে, কে জানে।

অরণ্যাভ্যন্তরে মধ্যাহ্ন সময়েও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না—অন্য সময়ের কথা ত দূরের। নিবিড়তানিবন্ধন লোকে ভয়ে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কে জানে, কখন্ কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু আক্রমণ করিবে।

এহেন কাননমধ্যে দুইটী মানব-মূর্ত্তি আসীন। উভয়েই যুবক, বলবান। দেহ তেজঃব্যঞ্জক, চক্ষুঃ জ্যোতিঃপূর্ণ। মাংসপেশী কঠিন, শরীর নিটোল।

অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ বলিলেন "তোমার সকলই অদ্ভুত। তোমার শরীরে মত্তহস্তীর বল আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, জ্ঞানে ও বিদ্যায় অনন্যসাধারণ। অথচ তোমার গতি বিচিত্র, কার্য্যকলাপ

প্রহেলিকাপূর্ণ। আমি বাল্যাবধি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুসরণ করিতেছি, তথাপি তোমার গতিবিধির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।”

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইল, সে হাসিয়া উত্তর করিল—“তোমার নিকট ত আমার গোপনীয় কিছুই নাই। তথাপি তুমি যখন তখন এইরূপ অনুযোগ করিয়া থাক, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।”

কনিষ্ঠ। ভাই, আশৈশব একত্র বাস, একত্র অধ্যয়ন, একত্র আহার, একত্র বিচরণ করিতেছি। বুঝি ভায়ে ভায়ে এত প্রণয়, এত স্নেহপ্রীতি হয় না। তুমি যে আমাকে ভালবাস, বিশ্বাস কর, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আমি জানি, বুঝি, আমাকে তুমি যেমন ভালবাস, এমন আর কাহাকেও ভালবাস না। কিন্তু তথাপি বুঝিতে পারি না, কেন এই ভাবে, দস্যু তস্করের ন্যায় তুমি সংসারে বিচরণ করিতে ভালবাস। সৎপথে থাকিয়া কি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না?

জ্যেষ্ঠ। তুমি যাহাকে অসৎ বলিয়া ভাবিতেছ, তাহা যে অসৎ, তাহা তোমাকে কে বলিল? আমি পৃথিবীতে দস্যু তস্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলাম। ধন জন কিছুরই অভাব ছিল না। লেখাপড়াও শিখিয়াছিলাম। কিন্তু কে আমার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল? আমি সমাজের—জনসাধারণের—কি অপকার করিয়াছিলাম যে, সকলে আমার উপর খড়্গহস্ত হইল? পিতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সংসারে একমাত্র ভার্য্যা অবলম্বন হইল। সে বালিকা, সংসার-অনভিজ্ঞা। আমার অসময় দেখিয়া, আমাকে অশক্ত ও সহায়হীন ভাবিয়া প্রবল জমিদার আমার সর্ব্বনাশে তৎপর হইল—সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে পথের ভিখারী করিল। কৈ সমাজ ত আমাকে রক্ষা করিতে আসিল না? দেশে এত লোক ছিল, কেহ ত একটা টুঁ শব্দ করিল না? মিথ্যাবাদী, পরস্বাপহারী জমিদারের সেটা কি সৎপথ? আর আমার এটা এতই কি ঘৃণিত অসৎ পথ?

কনিষ্ঠ। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিবার জন্য ভগবান আছেন। তিনি শান্তিদাতা ও শাস্তিদাতা।

জ্যেষ্ঠ। উহা অবলাগণের প্রবোধ বচন—অক্ষম, দুর্ব্বল, দীন হীনের সান্ত্বনাবাক্য। আমি উহা মানি না। তুমি আমার শিরশ্ছেদ করিতে অসি উত্তোলন করিবে, আর আমি ভগবানের দোহাই দিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, পড়িয়া থাকিব, ইহা কখনই স্বাভাবিক নিয়ম নহে। প্রকৃতি এখানে বিদ্রোহী হইয়া থাকে। এ সংসারে বলের জয়ই সর্ব্বত্র। ইংরাজিতে বলে, might is right. একবার প্রাকৃতিক জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, তথায়ও নিরন্তর পরস্পরে সংঘর্ষ ঘটিতেছে—প্রবলের নিকট দুর্ব্বল নতশিরে পরাজয় স্বীকার করিতেছে। ইহাকেই বলে "Survival of the fittest."

কনিষ্ঠ। জড়প্রকৃতির নিয়ম কি সর্ব্বত্র অনুকরণীয়?

জ্যেষ্ঠ। প্রকৃতিই আমাদের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। এই পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহের প্রতিই লক্ষ্য কর না কেন? এখানেও প্রতি মূহুর্ত্তে, প্রতি নিমেষে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে। যাহা শরীরের উপযোগী—পোষক, শরীর তাহাই গ্রহণ করে, অন্য দ্রব্য পরিত্যাগ করে। আধিব্যাধির সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। ব্যাধির সহিত শারীরিক প্রকৃতির নিরন্তর সমর চলিতেছে। ব্যাধি শরীর অধিকার করিতে চাহে, প্রকৃতি তাহাতে বাধা দেয়। যেখানে শরীর পরাজিত, সেইখানেই ঔষধের প্রয়োজন। তাহার পর জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্‌ঘাটন কর, সেখানেও দেখিবে আধিপত্য স্থাপনার্থ জগতের যাবতীয় জীব সর্ব্বদা ব্যস্ত। যেখানে বন্যজন্তুর আবাস ছিল, তথায় প্রথমে অসভ্য বর্ব্বর জাতির অভ্যুদয় হয়। তাহার পর সভ্যজাতি আবার তাহাদিগকে বিতাড়িত বা নিহত করিয়া স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করে। আমাদের রামায়ণ মহাভারত হইতে আধুনিক মার্কিন জাতির ইতিহাস পর্য্যন্ত একবাক্যে ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তুমি নিষ্ক্রিয়,

নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিলে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাই তোমার ক্রিয়ার প্রয়োজন, মস্তিষ্ক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিচালন-ক্রিয়ার আবশ্যকতা। এই ক্রিয়া যতই অধিক হইবে, ততই প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিবে। পাশ্চাত্য সভ্য জাতি ইহার জলন্ত প্রমাণ। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি। সুতরাং ব্যক্তিগত কর্ম্মণ্যতা হইতেই জাতীয় জীবনের শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠ। যে কর্ম্মপটুতার কথা বলিতেছ, তাহা সদ্ভাবে পরিচালিত হইলে সুফল প্রসব করে। যাহারা মনুষ্যের শত্রু, সমাজের শত্রু, রাজবিধানে দণ্ডার্হ, তাহাদিগের কর্ম্মণ্যতা কি প্রশংসার্হ ?

জ্যেষ্ঠ। ভাই, সদসৎ বিচার করা বড়ই দুরূহ। তুমি যাহাকে সৎ বল, অন্যে তাহাকে অসৎ বলে। তোমার সমাজে যাহা ভাল, অন্যের সমাজে তাহা মন্দ। ইহার সহস্র সহস্র প্রমাণ দেখা যায়। সুতরাং যে বিধি এক জনের বা এক জাতি বা এক সমাজের উপযোগী, তাহা অন্য ব্যক্তি, জাতি বা সমাজের প্রতি প্রয়োজ্য না হইতে পারে। এই দস্যু তস্করের কথাই ধর না কেন। তোমার মনে আছে কি, সম্রাট এলেকজণ্ডারকে জনৈক দস্যুদলপতি কি বলিয়াছিল ? তুমি একটী নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, কিন্তু নরপতিগণ—কেবল রাজ্যলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া, অন্যায়রূপে সমরঘোষণাপূর্ব্বক—অযথা লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণসংহার করিলেও দণ্ডার্হ হন না। ইহা কি সনাতন বিধি ? একটী কথা জানিয়া রাখিও, মানুষ যখন স্বয়ং অসম্পূর্ণ, তখন তৎকৃত কর্ম্মও অসম্পূর্ণ হইবে।

কনিষ্ঠ। তোমার কথা সত্য হইলে, তোমার মতে কাজ করিলে, সংসারে শাসনশৃঙ্খলা আদৌ থাকে না, সমাজ বিপর্য্যস্ত হয়, দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়।

জ্যেষ্ঠ। মনে করিও না যাহা বলিলাম, তাহা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা। ফষ্টের সেই কবিতাটা মনে পড়ে কি ?

"Laws are transmitted, as one sees.
Just like inherited disease.
They're handed down from race to race
And noiseless glide from place to place.
Reason they turn to nonsense ; worse,
They make beneficence a curse !"*

সমাজ-শাসনের অর্থ কি ? সমাজ যদি সমদর্শী না হয়, সকলের প্রতি সমভাবে দণ্ডপ্রয়োগ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে সমাজের শক্তি কোথায় ? মর্য্যাদাই বা থাকে কৈ ? হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যখন আমি সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে আরম্ভ করিলাম, কৈ সমাজ ত তখন আমার উদ্ধারার্থ তিলমাত্র চেষ্টা করিল না ? দুর্ব্বৃত্তের দণ্ডবিধানের জন্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্তোলন করে নাই ? তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, লোকবলে ধনবলে দুর্ব্বল পীড়ন করিয়াও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, আর আমি সহায়-সম্পত্তি-হীন হইয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলে দণ্ডিত হইব, নানারূপে নিগৃহীত হইব, ইহাই কি সমীচীন বিধান ? যাহার বাহুতে বল আছে, হৃদয়ে তেজ আছে, সে কখনই এই বিচিত্র বিধান নীরবে পালন করিতে সম্মত হইবে না। আমি সংসারে অনেক জ্বালা সহিয়াছি সমাজের অনেক অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছি, তাই এই পথ অবলম্বন করিয়াছি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥§

প্রেমের অবতারে যিশুখৃষ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন, "I am not come

---

* Translation by Sir, T. Martin.

§ গীতা, ৪র্থ অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

to send peace on earth, but a sword." তাই বলিতেছিলাম, ভাই, ইহাই আমার প্রকৃষ্ট পথ।

কনিষ্ঠ। তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি বলিয়াই এতদিন তোমাকে এই পাপমার্গ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু তুমি কিছুতেই শুনিলে না। তুমি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ; তোমার সকল কথার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু ভাই, ইহা স্থির জানিও, এ কার্য্যের পরিণাম কখনই শুভ হইবে না। ঈশ্বর না করুন, যদি কখন বিপদে পতিত হও, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বন্ধুর সাহায্যের আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিও। ভাই, আমার এ শেষ কথাটীতে স্বীকৃত হও।

জ্যেষ্ঠ। তবে কি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে না? তোমাকে বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ জানিয়াই আমার সঙ্গে মিশিবার জন্য এতদিন চেষ্টা করিতেছি। ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমাকে যেরূপ ভালবাস, তাহাতে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে।

কনিষ্ঠ। ভাই, রাগ করিও না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব, তোমার অনুসৃত পথই সুপথ, ততক্ষণ আমি কোনমতেই তাহা অবলম্বন করিতে পারিব না।

জ্যেষ্ঠ। আর কি করিয়া বুঝাইব, জানি না। তুমি যদি দিনমানে চক্ষু বুজিয়া রাত্রি হইয়াছে বল, তাহা হইলে তোমাকে কি কেহ বুঝাইতে পারিবে, উহা রাত্রি নহে, দিবা দিবা?

কনিষ্ঠ। উপমাটা সঙ্গত হইল না। আমার বিশ্বাস তুমি ভ্রান্ত, সয়তান তোমার স্কন্ধে চাপিয়াছে, নতুবা তুমি উন্মার্গগামী উচ্ছৃঙ্খল হইবে কেন?

জ্যেষ্ঠ। আমি যে ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছি, তুমি ত তাহা প্রমাণ করিতে পারিলে না। ভাল, তুমি কি স্বীকার কর না, স্বার্থরক্ষার জন্য

সকলেই তৎপর? এই যে তুমি আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইতেছ, ইহার মূলেও স্বার্থপরতা বিদ্যমান নাই কি?

কনিষ্ঠ। কিসে?

জ্যেষ্ঠ। তোমার বিশ্বাস, সৎপথে থাকিলে তোমার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবে না। আমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, ইহা অসৎ বলিয়া তোমার বিশ্বাস। তাই তুমি এই পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছ না। নহে কি?

কনিষ্ঠ। হাঁ।

জ্যেষ্ঠ। এই ইষ্টসিদ্ধির ফল কি আত্মরক্ষা বা স্বার্থলাভ নহে?

কনিষ্ঠ। তর্কানুরোধে না হয় স্বীকারই করিলাম, স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। তাহাতে কি হইল?

জ্যেষ্ঠ। তাহাতে আমার যুক্তি আরও বলবৎ হইল। আমি বলিতেছিলাম, আত্মরক্ষাই সংসারের ধর্ম্ম। এই আত্মরক্ষার অর্থ আর কিছুই নহে, নিরন্তর প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ, বিপরীত ধর্ম্মীর সহিত প্রচণ্ড সমর। যে ধর্ম্মে বা সমাজে আত্মত্যাগ শিক্ষা দেয়, সে ধর্ম্ম বা সমাজ আত্মহত্যার পক্ষপাতী হয়।

কনিষ্ঠ। কথাটা ভাল বুঝিলাম না।

জ্যেষ্ঠ। ইংরাজিতে একটা প্রবচন আছে "Man is a fighter", সুতরাং আত্মোৎসর্গ জীবন-ত্যাগ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? জনৈক পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন "Self-sacrifice is a renunciation of life." জর্ম্মাণ চাণক্য* বলিয়াছেন "Among all political sins, the sin of feebleness is the most contemptible, it is the political sin against the Holy Ghost. সুতরাং দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

কনিষ্ঠ। তুমি নাস্তিকের ন্যায় কথা বলিতেছ। সংসারে সু কু উভয়ই

* Treitschke—Politik

আছে। তুমি কেবল কুনীতিরই কথাই বলিতেছ। তোমার কথা এই, সংসারে তুমি প্রপীড়িত। সমাজ, রাজবিধান কেহই তোমাকে যখন রক্ষা করে নাই, তখন তুমি স্বহস্তে অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। ভাই, ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার শক্তি, প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি কতটুকু! সমাজ বা রাজবিধানের আশ্রয় যেরূপে লইতে হয়, তুমি হয়ত তদ্রূপ লও নাই, কাজেই সফলকাম হও নাই। আর এক কথা। আমরা হিন্দু, আমরা বুঝি, সকল স্থানে আমাদের কর্তৃত্ব খাটে না। আমাদের কর্ত্তা সমাজের নেতৃবর্গ এবং দেশের রাজা। সেই রাজার উপর আবার যিনি রাজা আছেন, তিনি সমদর্শী, ন্যায়বান, সুবিচারক। যেখানে সমাজ বা রাজা দণ্ড দিবার সুযোগ না পান, সেখানে পরমেশ্বর তুলাদণ্ডে ন্যায়বিচার করিয়া অপরাধীর—পাপীর—শাস্তি প্রদান করেন। এই বিশ্বাসের বলেই হিন্দু আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

জ্যেষ্ঠ। বুঝিলাম, এতদিন আমি ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়াছি, দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়াইয়াছি। তোমাকে যখন কিছুতেই আমার মতাবলম্বী করিতে পারিলাম না, তখন জানিও ভাই, এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত ত্যাগ করিতে পারি—পাষাণবৎ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারি। অন্যের কথা ত দূরে, তুমি যদি আমার কার্য্যের অন্তরায় হও, আবশ্যক হইলে, তোমার ন্যায় প্রাণের বন্ধুকেও নিহত করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। যাও, এখন গৃহে যাও। আর কখন আমার সংবাদ লইও না, ভাবিও আমি নাই—”

বলিতে বলিতে বক্তার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল।

বয়ঃকনিষ্ঠ আর কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিপিনে বন্ধুবরকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান করিল।

পাঠক! এই যুবকদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই পূর্ব্বপরিচ্ছেদবর্ণিত আগন্তুক—রমার জীবনসর্ব্বস্ব।

(৩)

রমা যে গ্রামে বাস করে, তাহার নাম বেলেডাঙ্গা। একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামে চারি বর্ণের লোকের বাস। তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যাই অধিক। প্রত্যেক জাতির জন্য এক এক পল্লী নির্দ্দিষ্ট, যথা—বামুনপাড়া, কামারপাড়া, হাড়িপাড়া, ইত্যাদি। এই সুশ্রেণীবদ্ধ, শৃঙ্খলাবিশিষ্ট,নানাজাতি অধ্যুষিত গ্রামের ভূম্যধিকারীর নাম মনোহর মুখোপাধ্যায়। ধনে মানে, কুলে শীলে, জ্ঞানে গুণে তিনি সর্ব্বজনমান্য। তিনি ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, আতিথেয়তায় প্রসিদ্ধ।

মনোহর বাবুর একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের নাম করুণাময়, কন্যার নাম লীলাবতী। করুণাময় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বিএ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। পুত্র পিতার অনুরূপ গুণাবলীতে বিভূষিত।

মনোহর বাবুর ভার্য্যার নাম সাবিত্রী। তিনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। পুত্র-কন্যার চরিত্র-গঠনের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি সফলকামা হইয়াছিলেন।

লীলাবতীর বিবাহ। অদ্য গাত্র-হরিদ্রা। মনোহর বাবুর বাটীতে নানাস্থান হইতে আত্মীয় স্বজন আসিয়াছেন। জমীদার-ভবনে ভূরিভোজন, হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। বহির্ব্বাটীতে নহবৎ বাজিতেছে, কখনও বা দেশী ঢোল ও কাঁসির শব্দে দিগন্ত উদ্বেলিত হইতেছে। লোকজন, দাসদাসী সকলেই সোৎসাহে ও সানন্দে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ বাড়ী সাজাইতেছে, কেহ খাদ্যাদির আয়োজন করিতেছে। চারিদিকে হাঁক ডাক পড়িয়া গিয়াছে। বালকের দল নববস্ত্র পরিধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামে আনন্দস্রোত উথলিয়া উঠিতেছে।

মনোহর বাবুর অন্তঃপুরেও আত্মীয়দল নানাকার্য্যে ব্যস্ত। কেহ লীলাবতীর অঙ্গরাগ করিতেছে, কেহ অন্নব্যঞ্জনের পাকে নিযুক্ত, কেহ কুট্‌না কুটিতেছে, কেহ বাট্‌না বাটিতেছে, কেহ দ্রব্যাদি ভাণ্ডারজাত করিতেছে,

কেহ সম্মার্জ্জনায় নিযুক্ত। সকলেরই মুখে হাসি—প্রীতিপ্রফুল্লতার পূর্ণবিকাশ। কোথাও বা আমোদ আহ্লাদ, কৌতুক পরিহাসের স্রোত বহিতেছে। মধ্যাহ্নকালে—আহারের সময়ে—গ্রামের আবালবৃদ্ধ বণিতা জমিদারের বাটীতে আসিল—কেবল আসিল না রমা। অপরাহ্নে বর্ষিয়সী বামুনগিন্নি বলিলেন, "রমার যৌবনের ভরে পৃথিবী টলমল। পোড়া যৌবন সকলেরই একদিন হয়। কিন্তু এমনটা কখন দেখিনি। রমা রূপের গৌরবে ধরাকে যেন সরা দেখে।"

আর একজন প্রৌঢ়া উত্তর করিলেন, "ও বেটীর কথা ছেড়ে দাও। ওর জাতটা কি একবার ভেবে দেখ না। বামুন কায়েতের মেয়ে হলে কি অত ডেমাক হ'ত? জেলের মেয়ে, তার আর কত বুদ্ধি হ'বে বল?"

বামুনগিন্নি নথ নাড়িয়া পুনরপি বলিলেন "তা হ'ক সে জেলের মেয়ে, তা ব'লে কি বুদ্ধি নেই বল্‌বো? ওকথা শুনি না, মাগীটা বড় ডেমাকে। কি বলব, সাবিত্রী আমাদের ভারি ভাল মানুষ, সাত পাঁচ বোঝে না, নইলে মাগীকে ঝাঁটা মেরে গাঁ থেকে বের করে দিত। এতবড় স্পর্দ্ধা, জমিদার—ব্রাহ্মণ—তাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত কাজ-কর্ম্মে আসে না।"

বিনোদিনী পূর্ণযুবতী, দুই চারি খানি নভেলও পড়িয়াছেন। স্বামী কলিকাতায় চাকুরী করেন। বলিলেন 'রমা যদি পরের বাড়ীতে ভিক্ষে ক'রতে না যায়, নেমন্তন্নের নামে দশ ক্রোশ না ছোটে, তাতে তার সুখ্যাতিই করা উচিত। যার আত্মসম্মান-বোধ আছে, সে যেখানে সেখানে পাত পাততে যায় না।"

বিনোদিনীর কথায় বামুনগিন্নি উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিলেন। নথ নাড়িয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন "নেগো নে, তোকে আর পণ্ডিতগিরি করতে হ'বে না। আজ কাল্‌কার একরত্তি মেয়েদের কথা শুন্‌লে হাড় জ্বলে যায়। দু-পাত বই পড়ে মনে করে, না জানি কত পণ্ডিৎনী হ'য়েছেন। আত্মসম্মান! আলে

আমার বিদ্বানী! আত্মসম্মান কাকে বলে জানিস? গরীবের আবার আত্ম-মর্য্যাদা কি? জেলের মেয়ে, একবেলা ও ভুটো অন্ন জোটে না, তার আবার আত্মসম্মানের জন্যে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ীতে আসা হলো না? তোদের বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়।"

বিনোদিনী ভয়ে আর কথা কহিতে পারিলেন না। এমন সময়ে সাবিত্রী উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগিন্নি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "আঃ মরি, মরি! মায়ের মুখখানি শুকিয়ে গেছে! এখনও জল খাওনি কি মা?" সাবিত্রী সহাস্যে বলিলেন "খেয়েছি। তোমাদের চেঁচামেচী হচ্ছিল কিসের?"

বামুনগিন্নি। আর মা, এই বিনির কথা শুন্‌লে হাড় জলে যায়। ঐ যে মথ্‌রো জেলের মেয়ে রমি—ঐ যে বেটী দর্পে মট্‌মট্‌ করছে—বেটী সকাল থেকে একবার এ বাড়ীতে উঁকী পর্য্যন্ত মাল্লে না, তাই বেটীর কথা বল্‌ছিলাম। বিনি তার হয়ে বলে কি না 'তার আত্মমর্য্যাদা আছে, তাই হয়ত আসেনি!' হা মা, একে কি আত্মমর্য্যাদা বলে? আমি অসৈরণ সইতে নারি।

সাবিত্রী বলিলেন, "হয়ত রমার অসুখ করেছে, তাই আসতে পারেনি। আমরাও ত তার খবর নিই নি। আর খানিকক্ষণ দেখি, যদি না আসে, একটা লোক পাঠাব।"

সাবিত্রীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে রমা আসিল। রমার পরিধানে মলিন বস্ত্র, কেশ রুক্ষ, তথাপি রূপ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। রমাকে দেখিয়া সাবিত্রী বলিল "এই যে রমা এসেছে। আয় রমা, এত দেরী হল কেন?"

রমা পদনখ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে নতশিরে দণ্ডায়মানা রহিল, কোন উত্তর দিল না।

সাবিত্রী। তোর অসুখ করেছে কি?

রমা একটী ক্ষুদ্র 'না' বলিয়া নীরব রহিল।

সাবিত্রী কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। সুযোগ পাইয়া ব্রাহ্মণগিন্নি চোকা চোকা বাক্যবাণে রমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রমা নীরবে সকলই সহিল, একবিন্দু অশ্রু তাহার নেত্রকোণে দেখা দিল।

হায়! এজগতে লোকে দরিদ্র হয় কেন? যে দরিদ্র হয়, তাহার হৃদয়ে প্রেম-প্রবাহ ছুটে কেন? আবার প্রেমার্দ্র হৃদয় হইলে লোকের টিট্‌কারী, গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় কেন? রমা এ সকল কথা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

(৪)

শ্রাবণ মাস। নভোমণ্ডল ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন। সমস্ত রাত্রিই বৃষ্টি হইতেছে। দূরে ভেককুলের আনন্দধ্বনি, আর বৃক্ষ হইতে জলবিন্দু পতনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল মাত্র।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সূচিভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দুই ব্যক্তি লগুড় হস্তে শনৈঃ শনৈঃ বেলেডাঙ্গার গ্রামপথ অতিক্রম করিতেছিল। তাহাদিগের মূর্ত্তি ভীষণ, দেহ সুদৃঢ়, মাংসপেশীগুলি কঠিন পাষাণবৎ। এই তামসী নিশিতে, এই ভীষণ দুর্য্যোগে তাহারা গ্রামপথ অতিক্রম করিতে তিলমাত্র ভীত নহে। ঝঞ্ঝাবৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহারা জমিদার মনোহর বাবুর প্রাসাদের পশ্চাদ্দিকস্থ উদ্যান সন্নিধানে উপস্থিত হইল। নিমেষের মধ্যে দুই জনে কি পরামর্শ করিল। অতঃপর একজন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উদ্যান মধ্যে উপনীত হইল। অন্যব্যক্তি সিংহদ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া একবার অট্টালিকার চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর হস্তস্থিত যষ্টিতে ভর দিয়া প্রাচীরোপরি উঠিল। প্রাচীর হইতে প্রাঙ্গণ, তাহার পর দ্বিতলস্থ ছাদ, অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিল।

একে বর্ষার রাত্রি, তাহাতে ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল, সুতরাং সমগ্র গ্রামখানি যেন সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। আগন্তুক

ব্যক্তিদ্বয়ের কার্য্যকলাপ কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। যে লোকটী ছাদে উঠিয়াছিল, সে ক্রমে ক্রমে ছাদের যে অংশের সন্নিধানে উদ্যান অবস্থিত, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ছাদের উপর হইতে নিম্নে উদ্যানের দিকে একবার চাহিল। দেখিল, বৃক্ষরাশির মধ্যে একস্থানে খদ্যোতের ন্যায় যেন একটী ক্ষীণালোক এক একবার জ্বলিতেছে। ইহাতে তাহার আনন্দ, উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তখন সে অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আমরা এইখানে মনোহর বাবুর বাটীর একটু বর্ণনা করিব। নতুবা পাঠক, পরবর্ত্তী ঘটনা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

যাহারা সেকালের ভূম্যধিকারীদিগের বাটী দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সে সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। মনোহর বাবু বড় জমিদার, প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া তাঁহার প্রাসাদ ও উদ্যান। বাটীর চারিদিকে পরিখা, তাহার পর উচ্চ প্রাচীর। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের মধ্যে বাটীতে প্রবেশের চারিটী দ্বার আছে। তন্মধ্যে সম্মুখস্থ তোরণ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সিংহদ্বার নামে পরিচিত। ইহার উপর নহবৎখানা। এই দ্বার চতুষ্টয় হইতে চারিটী সেতু পরিখার উপর দিয়া সম্মুখস্থ রথ্যায় মিলিত হইয়াছে। প্রাচীরের পরই প্রাঙ্গণ, তৎপরে দ্বিতল বাটী। এই দ্বিতল বাটীর উপরিভাগে জমিদার বাবুর বৈঠকখানা, তোসাখানা প্রভৃতি অবস্থিত। নিম্নাংশের একদিকে দ্বারবান প্রভৃতি ভৃত্যদিগের অবস্থানগৃহ, অন্যদিকে দপ্তরখানা, দেওয়ান কারকুণ প্রভৃতি কর্ম্মচারীর কার্য্যালয়।

এই দ্বিতল বাটীর পশ্চিমাংশে পূজার দালান। তাহার পর উঠান। পূর্ব্বাংশে অন্দরমহল ও উত্তরাংশে পাকশালা। তাহার পর উদ্যান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছাদ হইতে একব্যক্তি অন্তঃপুরে অবতরণ করিল। সে কাহাকেও কিছু বলিল না, পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় সহজে নিম্নতলে আসিয়া

উদ্যানে প্রবেশের পথে উপনীত হইল। এই পথের শেস সীমায় একটী অর্গলবদ্ধ দ্বার ছিল। অর্গল উন্মোচনান্তর লোকটী উদ্যানে প্রবেশ করিল। যেখানে আলোক জ্বলিতেছিল, তথায় যাইয়া সঙ্গীর সহিত মিলিত হইল। কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মধ্যে কি-একটা পরামর্শ হইল। তৎপরে উভয়েই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে একটা দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। রাত্রিতে এই দ্বার অন্তঃপুরের দিক হইতে অর্গলবদ্ধ থাকিত। আগন্তুকদ্বয় এই দ্বারসন্নিধানে আসিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ আছে কিনা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্দরমহল হইতে ঘোর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। চারি দিক অন্ধকার। যে দুই একটী দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাপিত। রজনীর সেই ঘনান্ধকারে অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল—রমণীদিগের গাত্র হইতে পর্য্যন্ত অলঙ্কারাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল।

অন্তঃপুরে মনোহর বাবু ও তদীয় পুত্র করুণাময় ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ ছিলেন না। করুণাময় লীলাবতীর বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। রমণীদিগের আকস্মিক চীৎকারে উভয়েই প্রথমে বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সে ভাব তিরোহিত হইল। তাঁহারা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন, ঘোরান্ধকারে সমস্ত বাটী আচ্ছন্ন। কাজেই তৎক্ষণাৎ আলোক প্রজ্বলনে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু একি? নিমেষমধ্যে কোথা হইতে যমদূতসম দুইটা লোক আসিয়া অমিত বলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। মনোহর বাবু ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। করুণাময় আক্রমণকারীর কবল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি মনোহর বাবুকে ধরিয়াছিল, সে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

এই সময়ে করুণাময় আক্রমণকারীকে মুষ্ট্যাঘাতে এরূপ জর্জ্জরিত করিতে-ছিলেন যে, তাঁহার নিষ্কৃতিলাভের আর বিলম্ব ছিল না। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া করুণাময়কে আক্রমণ করিল। করুণাময়ের আর গত্যন্তর রহিল না। দস্যুরা নিমেষমধ্যে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তিনি মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া পাশবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরের এই গোলযোগের সংবাদ—স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনধ্বনি—বহির্ব্বাটীতে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তখন দোবে চোবেরা বড় বড় লাঠি লইয়া অন্দরমহলের দিকে দৌড়াইল। কিন্তু প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ। রামসিং জমাদার দ্বার ভগ্ন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল। দ্বারবানেরা তাহাই করিল। তখন আগন্তুকদ্বয় যথেষ্ট অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা উদ্যানপথে পলাইল। দ্বারবানেরা অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া অগ্রে বাবুদের শয়নাগার অভিমুখে ছুটিল। মনোহর বাবুর ও করুণাময়ের অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ উভয়ের বন্ধন মোচন করা হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বাটীর সর্ব্বত্রই আলোকিত করা হইল। কিন্তু কোথাও দুর্ব্বৃত্তদিগের সন্ধান পাওয়া গেল না। জমিদার বাবু দ্বারবান দিগকে উদ্যানের দিকে যাইতে বলিলেন। দ্বারবানেরা যখন উদ্যানে উপনীত হইল, তখন দস্যুদ্বয় উদ্যান-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছে।

কিন্তু একি? উদ্যানের বহির্ভাগে এ কাহার চীৎকার ধ্বনি? এ কিসের শব্দ? যেন যথাবিক্রমে উভয়পক্ষ লগুড়ের বল পরীক্ষায় নিযুক্ত। দ্বারবানেরা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, বহির্ব্বাটীর দিকে পুনরায় ছুটিল। সিংহদ্বার দিয়া ঘুরিয়া পূর্ব্বাংশে উপনীত হইতে যে সময় লাগিল, সে সময়ের মধ্যে সকল কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল। যে স্থানে লাঠি চলিতেছিল, সে স্থানে জনমানবও নাই। কাজেই দ্বারবানেরা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিল।

দেখিতে দেখিতে জমিদারের বাটী লোকে পরিপূর্ণ হইল। জমিদার মহাশয় বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেওয়ানজীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ফাঁড়ীতেও সংবাদ দেওয়া হইল। গ্রামের অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। দস্যুরা কে, কোথা হইতে আসিল, কিরূপে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, ইত্যাদি নানাবিধ কথার আলোচনা হইতে লাগিল।

বাটীর ভিতরে তদন্ত করিয়া দেখা গেল, দস্যুরা কাহারও নথ ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে, কাহারও গাত্রাভরণ লইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা নিগৃহীত হইয়াছেন বামুনগিন্নি। তাঁহার আর্ত্তনাদে বাড়ী ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে করুণাময়ের খোঁজ পড়িল। সকলকে দেখিতে পাওয়া গেল, কিন্তু করুণাময় কোথায়? দস্যুরা করুণাময়কে বাঁধিয়াছিল, তাহার পর দ্বারবানেরা তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়াছিল। কিন্তু তৎপরে কি হইল, জানা যায় নাই। চারিদিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু করুণাময়ের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। জমিদার মনোহর মুখোপাধ্যায় মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বিপদের উপর বিপদ। অন্তঃপুরে আবার ক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। চারিদিকে হাহাকার পড়িল।

(৫)

জমিদারের বাড়ীতে দস্যুতা। পুলিস এ সংবাদে কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? একদিকে জমিদারের নিকট হইতে প্রভূত অর্থলাভের আশা—অন্যদিকে এই ডাকাতির একটা কিনারা করিতে পারিলে পদোন্নতি ও সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা, কাজেই পুলিশের লোকে 'ব্যস্ত-সমস্ত' হইয়া ঘটনাস্থলে তদন্তের ব্যপদেশে উপস্থিত হইলেন।

দারোগা মহাশয় লোক জনসহ আসিয়া হুলস্থূল ঘটাইলেন; হাঁক ডাক, ধর মার করিতে ক্রটী করিলেন না। কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। করুণাময়ের বা দস্যুদলের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। বহির্ব্বাটীতে যাইবার

দ্বার যে বন্ধ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তবে দস্যুরা কিরূপে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ? এ প্রহেলিকার সমাধান কেহই করিতে পারিলেন না। লোকে পূর্ব্বে যে তিমিরে ছিল, পুলিশ তদন্তান্তেও সেই তিমিরে রহিল। লাভের মধ্যে হইল, পুলিশ-পীড়নে গ্রামবাসীরা উত্যক্ত. এজেহার প্রমাণের দায়ে মনোহর বাবুর নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনেরা বিরক্ত।

প্রথমে থানার দারোগা মহাশয় সদলে তদন্ত করিতে আসিলেন। তাহার পর ইনস্পেক্টর, তাহার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এই পুলিশ তদন্তেই মনোহর বাবুকে অধিকতর বিব্রত হইতে হইল। তিনি বুঝিলেন, দস্যুরা যাহা করিতে পারে নাই, পুলিশ তদন্তে তাহা ঘটিল।

লীলাবতীর বিবাহ কিন্তু স্থগিত হইল না। পাত্রের পিতা মনোহর বাবুর বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের দিন পিছাইয়া দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মন্দলোকে এ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব করিতে বরপক্ষের ব্যয় যথেষ্ট হইয়াছে। বিধির বিপাকে যদি পরে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে বর পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই সম্ভবতঃ বিবাহ স্থগিত রাখিতে বরকর্ত্তা অসম্মত।" কেহ-বা বলিলেন, "সুধু ঐ টুকু নহে, আরও আছে। এ বিবাহে বরের বাপ একটা দাঁও মারিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভবিষ্যৎকালে নানারূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, তাই এত আপত্তি করিতেছেন।"

আমরা এইস্থানে বরের পিতার একটু পরিচয় দিব। পাঠক তাহা হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

বরের পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়, নিবাস লক্ষ্মণপুর। তাঁহার দুই কন্যা, এক পুত্র। কন্যাদ্বয়কে বহু কৌশলে, নানারূপ ছলনায়, ধনবান পাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। একটী কন্যা অপুত্রক এবং একটি বিধবা। বিধবার

শ্বশুরকুলে কেহ নাই—সম্পত্তি অনেক। রামধন চট্টোপাধ্যায় সেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক।

জ্যেষ্ঠা কন্যা যাঁহার গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি অস্ত্র-দন্তহীন; তুইবার বিপত্নীক হইয়া তৃতীয়বারে রামধন বাবুকে কৃতার্থ করিয়াছেন। নানারূপ ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তৃতীয়বারে, মুখরা ভার্য্যার প্রকোপে পড়িয়া শ্যালককেই পোষ্যপুত্রের ন্যায় পালন করিতে বৃদ্ধ বাধ্য হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের ভ্রাতুস্পুত্রাদি ছিল, কিন্তু তাহারা রামধন বাবু ও তদীয় কন্যার কৌশলে নিকটে আসিতে পারিত না।

এহেন রামধন বাবুর পুত্র শ্রীমান্ অঞ্জনাকুমার মনোহর বাবুর কন্যার পাণিপীড়নে অগ্রসর! মনোহর বাবু কৌলীন্যের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে যত্নপর ছিলেন বলিয়া এই বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ রামধন বাবুর ভার্য্যা শ্রীমতী বৃকোদরী দেবী স্বয়ং আসিয়া লীলাবতীকে দেখিয়া যাইবার সময় ভাবী বৈবাহিকার হস্তে স্বর্গের চাঁদ দিয়াছিলেন। লীলাবতী যে তাঁহাদের বাটীতে রাজ্ঞীবৎ অবস্থান করিবে, তাহার সুন্দর চিত্র তিনি সাবিত্রীর চিত্তপটে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিবাহে সাবিত্রীর আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের পরিসীমা ছিল না।

এত বড় একটা বিপদ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তথাপি রামধন চট্টোপাধ্যায় কয়েক দিবসের নিমিত্ত বিবাহোৎসব স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন না, হাতে মনোহর বাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি একবার মনে করিয়াছিলেন, রামধনের পুত্রের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিবেন না। কিন্তু সাবিত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ যখন বলিলেন, 'এ বিবাহ না হইলে মেয়ে 'ধোপড়া' হইবে, বিষম কলঙ্ক রাষ্ট্র হইবে, এমন কি লীলাবতীর আর বিবাহ হওয়া সঙ্কট হইবে,' তখন অগত্যা মনোহর বাবুকে রামধন বাবুর প্রস্তাবেই সম্মতি দান করিতে হইল। যেরূপ সমারোহে বিবাহ হইবার

বন্দোবস্ত হইতেছিল, তাহা আর হইল না। তবে রামধন বাবুর প্রাপ্যাংশ হইতে এক কপর্দ্দকও কমিল না।

শুভ কি অশুভ লগ্নে বিবাহ হইল জানি না। তবে মনোহর বাবুর বিষাদময়ী পুরীতে অনিচ্ছাকৃত বিবাহোৎব যথাসম্ভবরূপে সমাহিত হইল। আজি মনোহর বাবুর প্রাণের পুত্তলি, সাবিত্রীর নয়নের মণি করুণাময় নিরুদ্দেশ। দস্যুতায় গৃহ লণ্ডভণ্ড। তাহার উপর স্নেহ মমতার আধার প্রাণসম দুহিতা "পরের ঘরে" চলিল। যে বিবাহোৎসবের সূচনায় সর্ব্বত্র আনন্দরোল উত্থিত হইয়াছিল, সেই বিবাহোৎসবের অন্তে আবার গৃহে পুঞ্জ পুঞ্জ দুঃখ ঘনীভূত হইল। হর্ষ ধ্বনির পরিবর্ত্তে ক্রন্দনের মর্ম্মভেদী রব উত্থিত হইতে লাগিল, সর্ব্বত্র বিষাদের ছায়া প্রকটিত হইল। কেবল রামধন বাবু ও তদীয় পুত্র অঞ্জনাকুমারের অধরোষ্ঠে হাস্যরেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাই সংসারের গতি, বিশ্বের বিচিত্র-লীলা। একের সর্ব্বনাশ, অন্যের "পৌষমাস"; একের বিনাশ, অন্যের অভ্যুদয়। যেখানে যাও, যেদিকে চাও, সর্ব্বত্রই এই প্রহেলিকা, এই উৎকট রহস্য দেখিতে পাইবে।

যাঁহারা নিয়তি মানেন না, "পুরুষকারকেই" প্রবল বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা লীলাবতীর বিবাহ সম্বন্ধে কি বলিবেন জানি না। সংসারে যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনে সিদ্ধহস্ত, সঙ্কল্পসাধনে সমর্থ, দীন হীন অবস্থা হইতে ধনবান হইয়াছেন, তাঁহারা অদৃষ্ট মানেন না। কারণ, তাঁহাদিগের অদৃষ্ট মানিবার প্রয়োজন নাই। সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। ইহা যে পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলে হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে ইহারা সম্মত নহেন। মদগর্ব্বান্ধ মানব অনেক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না—কর্ম্মফলের কথা ত দূরের।

যাঁহারা বিপদে ঠেকিয়া, নানারূপ বিপাকে পতিত হইয়া অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনবৎ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক কর্ম্মে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার

পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পান। ভগবৎভক্ত মনোহর বাবু তাই বিপদে ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইলেন, আর 'ভুঁইফোঁড়' রামধন বাবু স্বকীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় দিগন্ত ফাটাইতে লাগিলেন।

লীলাবতী শ্বশুরবাড়ী যাইবে। একেই ত করুণাময়ের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তদুপরি প্রাণসমা দুহিতার ভাবী বিচ্ছেদ আশঙ্কায় মনোহর বাবু ও তদীয় পত্নী অধীর হইলেন। উভয়েরই বক্ষঃস্থল নয়নাসারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। লীলাবতীও কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলাইল। সকলের মুখেই বিষাদের ঘনচ্ছায়া প্রকটিত হইল। সমস্ত পুরীই বিষাদপূর্ণ। তিন দিবস পূজান্তে, বিজয়া দশমীতে, মহামায়াকে বরণ করিবার সময় পুরাঙ্গনাদিগের আঁখিজল যেমন উথলিয়া উঠে, লীলাবতীর শ্বশুরবাটী গমনের উদ্‌যোগে আজি মনোহর বাবুর বাটীতে তদ্রূপ দুঃখস্রোত প্রবাহিত হইল। অবশেষে লীলাবতী শ্বশুর ও স্বামী সহ যাত্রা করিল। মনোহর বাবুর বাড়ী আরও যেন শূণ্যময় হইল।

(৫)

দুই দিন হইল লীলাবতী লক্ষ্মণপুরে আসিয়াছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই শ্বশুরবাড়ীতে তাঁহার তিষ্ঠান যেন দায় হইল। সংসারের রীতি এই, যে যেমন, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গও তদ্রূপ হইয়া থাকে। রামধন বাবু বা তাঁহার সহধর্ম্মিণী বৃকোদরীর সহিত যাহাদের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা, তাহারাও সমভাবাক্রান্ত, সমপ্রকৃতিসম্পন্ন। লীলাবতী সম্বন্ধে বৃকোদরী বা তাঁহার প্রিয় প্রতিবেশিনীকুল একে একে নানারূপ দোষ বাহির করিতে লাগিল। কেহ বলিল নাক চ্যাপ্‌টা, কেহ বলিল কপাল উঁচু, কেহ বলিল চক্ষু ছোট, কেহ বলিল চুল খাট, কেহ বলিল ঠোঁট পুরু, কেহ বলিল গাল থেবড়ো, কেহ বলিল রংএর জলুস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে— বৃকোদরী ইহার উপর বলিতে লাগিলেন, "জোচ্চোরের মেয়ে, বাপ্‌ যা দেবে

বলেছিল, তা দের নাই। পেতল কাঁসর দান সামগ্রীগুলা নিতান্ত খেলো, রূপার দান ত একেবারেই মাটী। আর গহনাগুলা পানে ভরা ও ওজনে কম। কে জান্‌তো বল, ভদ্দর লোকে এমন জোচ্চোর হয়? তা হলে কি অমন জায়গায় আমরা এমন সোণার চাঁদের বিয়ে দিই?"

এখন সোণার চাদের একটু রূপ বর্ণনা করা আবশ্যক। রামধন বাবুর বংশানুক্রমে একটা বিশেষ লক্ষণ আছে। তাঁহাদিগের বর্ণ মসীসদৃশ ও ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত ও স্থূল। সকলের চক্ষু একপ্রকার ছিল কি-না বলিতে পারি না, তবে রামধন বাবুর ও অঞ্জনাকুমারের চক্ষের প্রশংসা কুত্রাপি শুনা যায় নাই। নাসিকা অন্যান্য অংশের অপেক্ষা সাতিশয় দীর্ঘ। এরূপ পুরুষ-প্রধান, কন্দর্প-কান্তি অঞ্জনাকুমার যে বৃকোদরীর সোণার চাঁদ হইবেন, বিচিত্র কি?

লীলাবতীকে কুৎসিতা কদাকার বলিয়া বৃকোদরী ও তদীয় সঙ্গিনীগণ যতক্ষণ বর্ণনা করিতেছিলেন,, ততক্ষণ লীলাবতীর বিশেষ দুঃখ হয় নাই. কিন্তু যখনই মনোহর বাবুর কুৎসা রটনা হইতে লাগিল, তখনই লীলাবতীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। সুধু স্ত্রীলোকেরা নহে, এ ব্যাপারে রামধন ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র অঞ্জনাকুমারও যোগ দিতে ক্ষান্ত হন নাই। লীলাবতী স্বামীর সহিত কথা কহিতে জানে না, অকর্ম্মণ্য পশুবিশেষ বলিয়া অঞ্জনাকুমার তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট শতমুখে নিন্দা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সে কথা রামধন বাবুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি বলিলেন, "আর কয়েক দিন দেখ্‌বো, তারপর না হয় অঞ্জনের ফের বিয়ে দেবো।"

লীলাবতীর সহিত যে সকল দাসদাসী আসিয়াছিল, তাহারাও রামধন বাবু, অঞ্জনাকুমার, বৃকোদরী প্রভৃতির বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা রহিল না। ;বহু দাসদাসী :পাঠাইয়া মনোহর বাবু যে রামধন বাবুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্টে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্রূপ

মন্তব্য প্রকাশ করিতেও রামধন বাবু বিরত হইলেন না। তিনি এমন কথাও বলিলেন, "মনোহর বাবুর এতই যদি পয়সা, এতই যদি মেয়ের উপর সোহাগ, তবে চাকর চাকরাণীর খাবার খরচটাও সঙ্গেও পাঠাইয়া দিলেন না কেন?"

এ সকল কথাতেও যখন দাসদাসীরা চলিয়া গেল না, তখন রামধন বাবু একদিন একটি ভৃত্যকে অকারণে প্রহার করিলেন। এই ধনঞ্জয় ব্যাপারে অঞ্জনাকুমারও যোগ দিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই মহৌষধের গুণে দাসদাসীরা রামধন বাবুর বাটী হইতে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। তাহারা মনোহর বাবুর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া সকল কথাই বলিল। মনোহর বাবু সমস্ত কথা শুনিলেন। লজ্জা, ঘৃণায়, অভিমানে মরমে মরিয়া গেলেন। অবশেষে বলিলেন, "অমন জামাইয়ের আর মুখ দর্শন করবো না, রামধন বাবুর সহিত আর কুটুম্বিতা রাখবো না। যদি লীলাবতীকে না পাঠায়, ভাববো, লীলাবতী মরে গিয়েছে।"

মনোহর বাবুর এই দারুণ কথা শুনিয়া লীলাবতীর অন্তরাত্মা শুকাইল। নির্জ্জনে নীরব রোদন ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর রহিল না।

বঙ্গসংসারে এরূপ ব্যাপার বিরল নহে। এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা মনে করেন, বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিবেন। আবার এমন অনেক ধুরন্ধর পুত্র আছে, যাহারা কেবল শ্বশুরকুলের অর্থশোষণই জীবনের মহাব্রত ভাবিয়া থাকে। কুটুম্বিতা-বিভ্রাটে অনেক সোণার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে।

(৬)

যে রাত্রিতে মনোহর বাবুর বাটীতে দস্যুতা হয়, সেই রাত্রিতে রমার পর্ণকুটীর হুতাশন-প্রকোপে ভস্মীভূত হইয়াছিল। দস্যুতার তদন্ত করিবার সময় পুলিশ রমার গৃহদাহ সম্বন্ধেও তদন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু রমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারিল না। প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল, রমা

অগ্নিকবলে জীবনত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু পরদিন প্রভাতে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও যখন রমার ভস্মাবশেষ পাওয়া গেল না, তখন কেহ কেহ অনুমান করিল, রমা দস্যুভয়ে কোথাও লুকাইয়া আছে, এখনই আসিবে। কেহ বা অন্যরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। রমার সহিত দস্যুদিগের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস না করিলেও, অনেকেই বলিল, "রমার কুটীর দস্যুরা দগ্ধ করিল কেন ?"

এই আসে এই আসে করিয়া রমার আগমনপ্রতীক্ষায় পুলিশের দলবল অনেক সময় নষ্ট করিল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হইল, রমা সুন্দরী যুবতী, সুতরাং দস্যুরা হয়ত সন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করণাশায় ঘরখানি দগ্ধ করিয়াছে। তখন এই সিদ্ধান্তই সকলে সমীচীন বলিয়া স্থির করিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সী গঙ্গার উপর দিয়া তর তর বেগে চলিয়াছে। নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিগুলি উত্থিত হইয়া তরণীকে মস্তক লইয়া যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ক্ষুদ্র তরিখানি একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। তরঙ্গরঙ্গে তরণীর ক্রীড়া মধুর ও নয়নানন্দদায়ক।

তরণীর উপর একটি ক্ষুদ্র ছৈ। ছৈটার ভিতরে একটি যুবক ও যুবতী। যুবকের শুশ্রূষায় যুবতী নিযুক্তা। এক ব্যক্তি তরণীর হাইল ও অন্যজনে দাঁড় ধরিয়াছে। তরণী শন্ শন্ বেগে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ছুটিয়াছে।

আকাশ নির্ম্মল, মেঘমুক্ত। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে ভূখণ্ড বিদীর্ণপ্রায়। গঙ্গাতীর বৃক্ষসমাকীর্ণ, নীল পল্লবাবৃত। মনোহর দৃশ্য। একদিকে প্রখর রবিকরসন্তপ্ত উন্মুক্ত প্রান্তর, অন্যত্র শ্যামল-বৃক্ষলতাগুল্মসমাবৃত স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া-সমন্বিত নদীসৈকত।

এমন সময়ে মাঝী জিজ্ঞাসা করিল "ছোঁড়াটার চৈতন্য হইয়াছে কি ?"

নৌকাভ্যন্তরস্থিত যুবতী উত্তর করিল "না।"

মাঝী বলিল "তবে এইখানে ভিড়াই।"

তাহাই হইল। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি তীরে আসিয়া লাগিল। তখন সূর্য্যদেব মাথার উপর উঠিয়াছেন। বিহঙ্গকুল ভানুতাপ তাড়নে বৃক্ষশাখে পল্লবান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বায়ুতাড়িত বৃক্ষপল্লবের সরসর শব্দ ও প্রবাহিনীর কুল কুল ধ্বনি নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইতেছিল। সে সময়ের প্রকৃতিদেবীর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে অতি বড় পাষণ্ডকেও মুগ্ধ হইতে হইত।

নৌকা তীরে লাগিল। কর্ণধার ও ক্ষেপণিক ব্যতীত আর কেহ নামিল না। নৌকাখানি এক তরুমূলে বাঁধিয়া উভয়ে তীরে উঠিল। উদ্দেশ্য—সুবিধামত কোনস্থান পাইলে রন্ধনাদি করে।

উভয়ে যখন অদৃশ্য হইল, তখন যুবতী ধীরে ধীরে নৌকা হইতে অবতরণ করিল। একবার সভয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল, দেখিল কেহ কোথাও নাই। বৃক্ষমূলে যাইয়া নৌকাখানিকে বন্ধনমুক্ত করিল। যুবতী পুনরায় নৌকায় উঠিল। তরঙ্গবেগে নৌকাখানি আপনিই চলিল।

নৌকা যখন কিয়দ্দূর গিয়াছে, এমন সময়ে নাবিকদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল তীরে নৌকা নাই। তখন উভয়ে নৌকার অনুসন্ধান ব্যাপৃত হইল। অল্পদূর যাইয়া দেখিল, বহিত্র তীরবেগে তরঙ্গভরে ছুটিতেছে। রমণী পাইল ও হাল ধরিয়াছে। পূর্ব্বে যে কর্ণধার হইয়াছিল, তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। সে দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ নিপীড়ন করিতে লাগিল, অক্ষিদ্বয় হইতে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। একবার বজ্রনির্ঘোষে বলিল, "পাপীয়সি! নৌকা ফেরা।" সেই ভীম রব লইয়া দিগন্ত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বায়ুতরঙ্গে সে বজ্রনাদ নৃত্য করিতে করিতে রমণীর কর্ণপটাহে আঘাত করিল। যুবতী কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইল না, ধীরভাবে নৌকায় বসিয়া রহিল।

তরণী যখন ফিরিল না, তখন রোষে জ্ঞানহারা হইয়া সে উচ্চ তীরভূমি হইতে জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিল। সন্তরণপটুতানিবন্ধন অবলীলাক্রমে নৌকাভিমুখে যাইতে লাগিল। নৌকাও ছুটিতেছে, সন্তরণকারীও তীরবেগে প্রধাবিত হইতেছে! রমণী প্রমাদ গণিল।

যে ব্যক্তি সাঁতার দিয়া নৌকাভিমুখে যাইতেছিল, পাঠক বোধ হয় তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে রমা যাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, এ ব্যক্তি সেই। আর নৌকায় বসিয়া রমা দর বিগলিত ধারে বক্ষঃ ভাসাইতেছিল। হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইলেও কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতানিবন্ধন সন্তরণকারীর কবল হইতে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে সে সচেষ্ট। সে জানিত, যাঁহাকে যে সমস্ত প্রাণটা দিয়া ভালবাসিয়াছে, যাহার জন্য সে সংসারের সমস্তই ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, সেই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতার বিপক্ষতাচরণে আজি সে প্রবৃত্ত। সে জানে, সন্তরণকারী একবার নৌকা ধরিতে পারিলে তাহার আর নিস্তার থাকিবে না। সে বুঝে, সন্তরণকারী যদি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ভাগীরথী-গর্ভে নিমজ্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এই সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াও সে কেবল নৌস্থিত মূর্চ্ছিত যুবকের জন্য এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

পাঠক মনে করিবেন না, রমা যুবকের রূপগুণে মুগ্ধা বা প্রেমপাশে বদ্ধা। রমার হৃদয়ে সে পাপ প্রবৃত্তির লেশমাত্র নাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা তাহার হৃদয়কন্দর আলোকিত করিত। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি আর কেহ নহে—জমিদারপুত্র করুণাময়। করুণাময় কিরূপে দুর্ব্বৃত্তদিগের কবল হইতে মুক্ত হইবে, ইহাই তাহার চিন্তা ও চেষ্টা। সেই সুযোগ সমুপস্থিত, তাই রমা নৌকা লইয়া পলাইতেছিল।

যে রাত্রিতে মনোহর বাবুর বাটীতে দস্যুতা হয়, সেই রাত্রিতে দস্যুদ্বয়

সংজ্ঞাশূন্য করুণাময়ের দেহ বহন করিয়া রমার কুটীরে উপনীত হইয়াছিল। করুণাময়ের মস্তক হইতে প্রবলধারে রুধির নির্গত হইতেছে দেখিয়া রমা কাঁদিয় উঠে। কিন্তু দস্যুদিগের প্রবল তাড়নায় তাহাকে নীরব হইতে হয়। তখন দস্যুরা জলসিক্ত বস্ত্রদ্বারা করুণাময়ের মাথা বাঁধিয়া দেয়। নিকটেই একখানি পান্‌সী বাঁধা ছিল। দস্যুরা করুণাময়কে তাহার উপর লইয়া যায়। দস্যুদিগের আদেশে রমাকেও অনুগামিনী হইতে হইয়াছিল। তৎপরে দস্যুদ্বয় রমার কুটীর হইতে আহরণীয় দ্রব্যাদি লইয়া কুটীরে অগ্নি প্রদান করে। অবিলম্বে হুতাশন প্রকোপে কুটীর ভস্মীভূত হয়।

একে সন্তরণকারীর শরীরে অপরিমিত বল, তাহাতে আবার সন্তরণে তাহার অদ্ভুত পটুতা, সুতরাং নৌসন্নিধানে আসিতে তাহার বিশেস কষ্ট হইল না। রমা বেশ বুঝিল, এবার আর কিছুতেই নিস্তার নাই।

আর বিলম্ব নাই। সন্তরণকারী নৌকার সন্নিকটে সমুপস্থিত, নৌকা ধরিবার আর বিলম্ব নাই এমন সময়ে রমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"সাবধান! নৌকা স্পর্শ করিলে এই দাঁড়ের আঘাতে আহত করিব। আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে করুণাময় বাবুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিব না।"

এই সময়ে করুণাময়ের অল্প অল্প চৈতন্যের সঞ্চার হইতেছিল। রমার কথা তাঁহার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

সন্তরণকারী বলিল "কেন, করুণাময় কি তোমার জার?"

রমা জিহ্বা কাটিয়া বলিল—"জার নহে জনক।"

সন্তরণকারীর মাথা ঘুরিল। সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মনে হইল, বিশ্ব চরাচর যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে। এতক্ষণ যে ঈর্ষানল তাহার অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশ পর্য্যন্ত ছারখার করিতেছিল, এক্ষণে সহসা তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, রমা করুণাময়ের উপর আসক্ত, তাই তাহার উদ্ধারের জন্য এত ব্যস্ত। সে যখন করুণাময়কে

বন্দী করিয়া আনে, তখন কুহকিনী আশা তাহাকে কতই না মুগ্ধ করিয়াছিল। এই করুণাময়ের উদ্ধার সাধনে জমিদার মনোহর বাবু বিস্তর টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিবেন। সেই বিপুল অর্থ হস্তগত করিয়া সে করুণাময়কে ছাড়িয়া দিবে। সুতরাং করুণাময়কে লইয়া রমার পলায়নে একদিকে যেরূপ হিংসার প্রবল দংশনে হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল, অন্যদিকে তেমনি নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে হৃদয় ডুবিয়া যাইতেছিল। তজ্জন্যই সে নৌকা ধরিতে ব্যস্ত। কিন্তু এ কি? রমা কি বলে? রমা কি তাহাকে ভুলাইবার জন্য এত বড় একটা মিথ্যা কথার অবতারণা করিল? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে রমাকে বিশেষরূপে চিনিত। রমার চরিত্র সে বিশেষরূপে বিদিত ছিল। সে পিশাচপ্রকৃতি হইলেও সদ্‌গুণ উপলব্ধি করিতে অক্ষম ছিল না। কাজেই রমার বাক্যে তাহার অনাস্থা হইল না।

কিন্তু তাহার এ ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। করুণাময় দ্বারা সে অনেক টাকা পাইবে। এ আশা সে ত্যাগ করিতে পারিল না। তাই বলিল, "করুণাময় তোমার যেই হউক, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তুমি সমুচিত শাস্তি পাইবে—তোমার রক্ষা—"

একি! ভৈরব কোথায়? দেখিতে দেখিতে ভৈরব জলগর্ভে নিমজ্জিত হইল। একটা অস্ফুট মর্ম্মধ্বনি—একটা ক্ষুদ্র জলভ্রমি উঠিল। যে স্থানে ভৈরব ডুবিল—সে স্থানটার জল একটু লোহিতাভ হইল।

রমা ইহা দেখিল, সকলই বুঝিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। "কোথা যাও" বলিয়া তরণীবক্ষ হইতে সেই বিপুলকায়া নদীতে ঝম্ফ প্রদান করিল। আবার একটা আবর্ত্ত উঠিল। প্রথমে বড়—তাহার পর ছোট, তাহার পর ক্ষুদ্রতর বৃত্তাকারে তরঙ্গ নাচিয়া বেড়াইল, তাহার পর আবার স্থির হইল। সেই ঘূর্ণিগুলি যাহাদের জন্য উত্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে কুক্ষিগত করিয়া যেন তৃপ্ত হইল। নদী আবার পূর্ব্ববৎ প্রশান্তভাব ধারণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

আশা বৈতরণী নদী, সহজে পার হওয়া যায় না। আশার জন্যই মানুষের ধন জনের পিপাসা মিটে না। যাহার দিন চলা ভার, সে মনে করে, কেবল সে দুই বেলা দুই মুঠা আহারের সংস্থান করিতে পারিলেই আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। সৌভাগ্যক্রমে যদি তাহা ঘটে, তখন মনে হয়, অর্থসচ্ছলতা আর একটু হইলেই, বস্! কিন্তু যতই অর্থাগম হইতে থাকে, ততই নব নব আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়। এই কুহকিনী আশা কিছুতেই মিটিতে চাহে না।

রামধন বাবুর তাহাই হইয়াছে। জামাতৃধনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই, এক্ষণে মনোহর বাবুর অতুল সম্পত্তির উপর লোলুপ-দৃষ্টি নিপতিত। কিসে মনোহর বাবুর বিষয় বৈভব করতলগত হইবে, তচ্চিন্তায় সতত ব্যাকুল। নানাবিধ কৌশলজাল বিস্তারে সচেষ্ট। প্রথমে লীলাবতীকে যথেচ্ছা পীড়ন করিতে লাগিলেন। মনোহর বাবুকে ও সাবিত্রীকে রামধন ও তদীয় ভার্য্যা বৃকোদরী নানারূপ কটুকাটব্যপূর্ণ, অভদ্রোচিত পত্রাদি লিখিয়া মর্ম্মাহত করিতেও ক্রটী করিলেন না। যখন তাহাতেও অভীপ্সিত ফল হইল না, তখন প্রিয়পুত্র অঞ্জনাকুমারের সহিত পরামর্শ করিয়া মনোহর বাবুর সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা হইল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

মনোহর বাবুর প্রকৃতির বিশেষত্ব ইহাই ছিল যে, তিনি কাহারও সম্বন্ধে একটা ধারণায় উপনীত হইলে, তাহা সহসা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। রামধন বাবুর ব্যবহার, লীলাবতীর উপর বৃকোদরীর, অঞ্জনাকুমারের ও অন্যান্যের অত্যাচার, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের উপর মনোহর বাবুর বিশেষ

বিতৃষ্ণা সমুৎপাদিত করিয়াছিল। সুতরাং বৈবাহিকের অকস্মাৎ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, বরং অধিকতর বিরক্ত ও সন্দিহানই হইলেন।

রামধন বাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। লীলাবতী যে তাঁহাদিগের নয়নের তারা অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়, কথায় ও ব্যবহারে তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। যে লীলাবতী শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়া অবধিই নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, সেই লীলাবতীর প্রতি হঠাৎ অত্যধিক যত্ন ও প্রীতি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। সরলমনা সাবিত্রী প্রথমে বিস্মিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে কুটুম্বদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্টা হইলেন। কেবল মনোহর বাবুই অসন্তুষ্ট রহিলেন।

রামধন বাবু এক্ষণে লীলাবতীকে পিতৃভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। যে শ্বশ্রূ, ননন্দা, স্বামী, শ্বশুর লীলাবতীকে গালিবর্ষণ—এমন কি সময়ে সময়ে প্রহার পর্য্যন্ত না করিয়া জলগ্রহণ করে নাই, তাহারাই এক্ষণে লীলাবতীগত প্রাণ হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, তাহারা মনোহর বাবুর বাটীতে ঘন ঘন তত্ত্ব প্রেরণ করিতে লাগিল, অঞ্জনাকুমার শ্বশুর শাশুড়ীকে "বাবা, মা" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

মনোহর বাবু এসকল লক্ষণ শুভজনক বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি সময়ে সময়ে সাবিত্রীদেবীর নিকটেও ইহা ব্যক্তও করিতেন। কিন্তু সরলা সাবিত্রী রামধন বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ভীষণ কুচক্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। করুণাময়ের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তায় ও পুত্রশোকে মনোহর বাবুর মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইল। সাবিত্রী ইহা বুঝিতে পারিলেন।

পুত্রের নিরুদ্দেশজনিত দুঃখানলে তাহার হৃদয়ও অহরহঃ বিদগ্ধ হইলেও স্বামীর নিকট সে ভাব যথাসাধ্য গোপন করিতেন। মনোহর বাবুর চিত্ত যাহাতে প্রফুল্লিত হয়, তৎবিধানে তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিতেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

একদা মনোহর বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। নিকটে বৈড়াল-ব্রতিক রামধন বাবু, অঞ্জনাকুমার ও দেওয়ান গোপীনাথ উপবিষ্ট। মনোহর বাবু বলিলেন, "অধুনা আমার শরীর যেরূপ অপটু হইয়াছে, তাহাতে চিকিৎসকেরা সত্বর বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ স্থানান্তরে যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। করুণাময়েরও কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। আমি স্বয়ং তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। বিষয়কর্ম্মে আমার বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল কারণে আমি কিছু দিবসের জন্য গোপীনাথের হস্তে বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিতে চাহি। এ সম্বন্ধে গোপীনাথের মত কি?"

গোপীনাথ। হুজুর, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনার অন্নে অধীন পরিপুষ্ট, সুতরাং যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই প্রাণপণে পালন করিব। তবে—

মনোহর বাবু। তবে আবার কি?

গোপীনাথ। অধীনের প্রার্থনা, আমার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য হুজুর আর কাহারও উপর ভারার্পণ করিলে ভাল হয়।

মনোহর বাবু। তোমার উপর আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। থাকিলে কখনই এ প্রস্তাব করিতাম না। কি বলেন বেয়াই?

রামধন বাবুর ধমনীতে তখন বিদ্যুৎবেগে শোণিত প্রবাহিত হইতেছিল। অঞ্জনাকুমারেরও রোষে ও অভিমানে ওষ্ঠ বিকম্পিত হইতেছিল। কিন্তু রামধন বাবুর ইঙ্গিতে অঞ্জনাকুমার সে ভাব গোপন করিল। রামধন বাবু

বলিলেন "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে ; তবে দেওয়ানজীর প্রস্তাবটীও মন্দ নহে। ভুল ভ্রান্তি সকল মানুষেরই হইয়া থাকে। আর একজন তত্ত্বাবধারক থাকিলে মন্দ হয় কি ?"

মনোহর বাবু বলিলেন, "আর কাহাকে পাইব ? মানুষ ত আর ধারে পাওয়া যায় না, অথবা ইচ্ছামত গড়া যায় না।" রামধন বাবু সহাস্যে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, বেয়াই মহাশয় আমাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিতেছেন। তা এর আর লজ্জা কি ? আত্মীয় কুটুম্ব কিসের জন্য ? যদি বিপদে আপদে সাহায্য না করিল, সে আত্মীয় থাকার ফল কি ? আমা দ্বারা যতদূর হয়, তাহা করিব। আমি দেওয়ানজীর কার্য্যকলাপ দেখিব। আর আমার অনুপস্থিতিকালে অঞ্জনাকুমারও দেখিতে পারিবে। ও-ও এসকল কার্য্যে খুব বিচক্ষণ, ব্যুৎপন্ন।"

রামধন বাবুর কথা পরিসমাপ্ত হইতে না হইতে গোপীনাথ বলিল, "হুজুর, ইহা অপেক্ষা আর কি সুবন্দোবস্ত হইতে পারে ?"

মনোহর বাবু যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। তিনি রামধন বাবুকে বিষয় কর্ম্মের কোন সংশ্রবে রাখিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধির বিপাকে বিভিন্নরূপ হইল। তিনি বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়কে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। গোপীনাথ একলাই সব কাজ চালাইতে পারিবে।"

গোপীনাথ সাধু ও সরল প্রকৃতির লোক। সে মনিবের মনোভাব বুঝিতে পারিল না। বলিল, "বেয়াই মহাশয়ের কষ্ট হইলে অগত্যা আমাকে হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইবে।"

রামধন বাবু দেখিলেন যে সুযোগটা চলিয়া যায়, কাজেই তাড়াতাড়ি বলিলেন "বেয়াই মহাশয় চিরকালই সৌজন্য ও বিনয়ে পূর্ণ। এই গুণেই লোকে তাঁহাকে ভালবাসে ও ভক্তি করে। আমরাও তাই বাধ্য। আমার

কোন কষ্ট হইবে না। আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতেছি।”

মনোহর বাবুর তখন গত্যন্তর রহিল না। তাঁহাকে অগত্যা সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইল। রামধন বাবু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। গোপীনাথ যেমন দেওয়ানের কার্য্য করিতেছিল, তাহাই করিতে লাগিল। রামধন বাবুর নামে মনোহর বাবু বাধ্য হইয়া আমমোক্তারনামা দিলেন।

(২)

মনোহর বাবুর বিদেশযাত্রার পর কয়েক দিবস রামধনবাবু ও অঞ্জনাকুমার সদয় ব্যবহারে সর্ব্বলকেই প্রীত করিতে লাগিলেন। গোপীনাথের মনে হইল, রামধন বাবু তাহার প্রভু মনোহর বাবু অপেক্ষাও ভাল লোক। সে কায়মনোবাক্যে রামধন বাবুর প্রীতি সাধন করিতে লাগিল। মনোহর বাবু গোপীনাথের পত্রে রামধন বাবুর কার্য্যকুশলতা ও সৌজন্যের সংবাদ পাইয়া কখন কখন মনে করিতেন, “রামধন বাবু সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা আছে, তবে কি তাহা ভ্রমাত্মক ?”

রামধন বাবু যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রথম কৌশল সফল হইয়াছে, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অঞ্জনাকুমারও পিতার অনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

প্রথমে আমলাদিগের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে লাগিল। যাহারা দুরদর্শী, রামধন বাবুর প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অসাধু কর্ম্মচারীরা রামধন বাবুর আনুগত্য করিতে লাগিল ; যাহারা ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন, তাহারা বাধ্য হইয়া একে একে পদত্যাগ করিল। এই কার্য্য রামধন বাবুর এরূপ সুশৃঙ্খলা ও কৌশলের সহিত সমাধান করিয়াছিলেন যে, কেহই রামধন বাবুর উপর কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারে নাই। যে সকল কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে রামধন বাবু মনোহর

বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'হিসাব নিকাশে অনেক গলদ বাহির হওয়ায় এবং চুরীর সুযোগ অনেক হ্রাস হওয়ায় অসৎ প্রকৃতির কর্ম্মচারীরা চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে। তাহাদিগের স্থলে সজ্জন ও সুচতুর লোক নিয়োগ করা হইতেছে।' বলা বাহুল্য, নব নিয়োজিত ব্যক্তিরা সকলেই রামধন বাবুর আজ্ঞাবহ দাস।

ক্রমে গোপীনাথের সহিত গোলযোগ আরম্ভ হইল। রামধন বাবুর পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা গোপীনাথকে প্রতিনিয়ত অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। অবশেষে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল যে, হয় গোপীনাথকে রামধন বাবুর আদেশানুরূপ অসৎ কার্য্য করিতে হয়, নতুবা পদত্যাগ অপরিহার্য্য হয়। গোপীনাথ প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। তাহার পর আনুপূর্ব্বিক সকল কথা মনোহর বাবুকে লিখিয়া পাঠাইল। মনোহর বাবু উত্তরে লিখিলেন, "মানুষ স্বকীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। তজ্জন্য অনুতাপ করা বৃথা।" গোপীনাথের যখন চৈতন্য হইল, তখন রামধন বাবুর আধিপত্য সুদৃঢ় হইয়াছে। গোপীনাথের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মনোহর বাবু রামধন বাবুকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেইজন্য গোপীনাথ একণে বিশেষ অনুতপ্ত ও দুঃখিত। কিন্তু দুঃখ ও অনুতাপ করিয়া এখন কোন ফল নাই। যে অনিষ্ট হইবার, তাহা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে।

মানুষের যখন সময় মন্দ হয়, তখন বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইতে থাকে। মনোহর বাবুর তাহাই হইয়াছে। প্রথমতঃ বাড়ীতে ডাকাইতি, তৎপরে করুণাময়ের নিরুদ্দেশ, তৎপরে কুপাত্রে লীলাবতীকে সমর্পণ, তৎপরে নিজের অসুস্থতা, এবং সর্ব্বশেষে গৃহত্যাগ ও রামধন বাবুর হস্তে বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ, এ সকলই দুঃসময়ের ফলে ঘটিল।

মনোহর বাবু কাশীধাম হইতে বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়াছেন। সেই-খানেই তিনি গোপীনাথের পত্রে রামধন বাবুর অসদ্ব্যবহারের সংবাদ প্রাপ্ত

হয়েন। তিনি পূর্ব্বে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমে ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতেছে বুঝিলেন। কিন্তু প্রতিকার করিতে পারিলেন না। করুণাময়ের শোকে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিষয় সম্পত্তি তাঁহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। উদ্যম উৎসাহ তাঁহাকে একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার উপর রামধন বাবুকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে হইলে পাছে অসহায়া লীলাবতীর উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি হয়, এতদাশঙ্কায় মনোহর বাবুকে নীরব, নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইল। ইহার ফলে, কিন্তু গোপীনাথের নির্য্যাতন বাড়িল। রামধন বাবু বুঝিলেন, কুটুম্বিতার খাতিরে, লীলাবতীর মুখ চাহিয়া, মনোহর বাবু যখন কিছু বলিতে পারিবেন না, তখন এই সুযোগে অভীষ্ট সিদ্ধ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি তদ্বৎ কৌশলই অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

রামধন বাবু প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা এরূপ বাড়িল যে, প্রজাবর্গ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে লাগিল। রামধন বাবু প্রজাকুলের নিকট হইতে নানারূপে অর্থশোষণ করিতে লাগিলেন। খাজনা আদায় দিতে কোন প্রজার বিলম্ব ঘটিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত। ইহার উপর রামধন বাবু মহলের সর্ব্বত্রই স্বকীয় অনুচরবর্গদ্বারা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যদি কোন প্রজা মনোহর বাবুর নিকট কোনরূপ অনুযোগ করিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তাহার "ভিটা মাটী চাটী" করিবেন। প্রজারা ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

প্রজারা গোপীনাথের নিকট কাঁদিয়া আকুল হইত—নানারূপে মর্ম্মযাতনা ব্যক্ত করিত। প্রজারা কাঁদিত, গোপীনাথ কাঁদিত, কিন্তু কেহই প্রতিকার করিতে পারিত না।

এই সময়ে একদিন সংবাদ আসিল, সাবিত্রী বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। একেই পুত্রশোকাদিনিবন্ধন মনোহর বাবুর বৈরাগ্যের

সঞ্চার হইয়াছিল, তদুপরি প্রাণসমা প্রিয়তমার বিয়োগে বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। বাড়ী ঘর, আত্মীয় স্বজন, জমিদারী তেজারতী কিছুতেই আর তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না।

সুতরাং রামধন বাবুর প্রজাপীড়নের, অর্থ লুণ্ঠনের সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিল। মনোহর বাবুর নিকট প্রতিকারাশায় কেহ কোন কথা লিখিয়া পাঠাইলে তাহার উত্তর পাইত না। মনোহর বাবু নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতেন, অনেক সময়ে অনুযোগ অভিযোগের পত্র তাহার নিকট যথাসময়ে পৌঁছিতই না। রামধন বাবু মনোহর বাবুর সম্পত্তির সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহার চিরপোষিত বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে বাকী কেবল মনোহর বাবুর সম্পত্তি নিজের নামে লিখাইয়া লওয়া। তিনি সে সুযোগও অন্বেষণ করিতে নিরস্ত হইলেন না। জাল জুয়াচুরীতে তিনিও পশ্চাৎপদ হইতেন না। কূট-বুদ্ধি দুষ্ট প্রকৃতি অনুচরেরও অভাব ছিল না। যাহারা তাঁহার নিয়োজিত কর্ম্মচারী, তাহা স্বতঃপরত সাহায্য করিতে লাগিল, পাবন পাবকের সাহায্যকারী হইয়াছিল।

(৩)

"হারামজাদি, জুতোর চোটে সোজা হবি।" রুদ্রমূর্ত্তিতে জনৈক যুবক একটী বালিকাকে প্রহার করিতে করিতে বলিল।

বালিকা ভূলুণ্ঠিতা হইয়া প্রহার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, আর অস্ফুট স্বরে "বাবা গো, মাঁ গো, আর মের না গো" বলিতেছে। পাষণ্ডের তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রহারের উপর প্রহার। মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, পদাঘাত কিছুরই বিরাম নাই। যেন পিশাচের হস্তে দেবকন্যা দলিত-হইতেছে।

আজি লীলাবতী নিজের পিত্রালয়েই এবংবিধ দুর্দ্দশাপন্না। প্রহারকারী অন্য কেহ নহে, নরপিশাচ অঞ্জনাকুমার। অঞ্জনার লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র অক্ষিদ্বয়ের

বিঘূর্ণন, বৃহৎ দর্শনপঙ্‌ক্তির পরস্পর সংঘর্ষণজনিত কড়মড়ি শব্দ, মাঝে মাঝে হুঙ্কারধ্বনি লীলাবতীর প্রাণপক্ষীকে যে পিঞ্জরমুক্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

রামধন বাবুর বিদেশ যাত্রার পর হইতে লীলাবতী ক্রমশঃ নিগৃহীতা হইতে লাগিল। অথচ পিতৃসন্নিধানে এসকল কথা লিখিয়া পাঠাইত না। কারণ, সে যখন পত্রাদি লিখিত, তখন অঞ্জনাকুমার তথায় উপস্থিত থাকিত। অঞ্জনাকুমার যাহা বলিয়া দিত, লীলাবতী তাহাই লিখিত। সুতরাং মনোহর বাবু লীলাবতীর কষ্টের কথা আদৌ জানিতে পারিতেন না।

অঞ্জনাকুমার শ্বশুরের বৈভবের অধিকারী হইয়া সুরাপানের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। সুরাপায়ী, বেশ্যাশক্তের কুসঙ্গের অভাব হয় না। অঞ্জনারও কুক্রিয়াজনিত নানা সহচর জুটিয়াছিল। ইদানীং অঞ্জনাকুমারের সহিত রামধন বাবুরও আর বড় একটা দেখা হইত না। রামধন বাবু অঞ্জনাকুমারের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিতেও সাহসী হইতেন না। আশঙ্কা, পাছে অঞ্জনাকুমার তাঁহাকে মনোহর বাবুর সম্পত্তি হইতে অপসারিত করে। অর্থলোভ এতই প্রবল যে মানুষ পুত্রের ভয়ে বিব্রত হইয়া পড়ে, পুত্রের কুকার্য্য নিবারণ করিতেও সাহসী হয় না, অধিকন্তু প্রকারান্তরে প্রশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে। রামধন বাবুর অবস্থাও ঠিক তাহাই হইয়াছে।

অঞ্জনাকুমারের অত্যধিক অত্যাচারে লীলাবতী জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। অথচ কেহ মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারে না, অঞ্জনাকুমারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে সাহসী হয় না। মনোহর বাবুকে গোপনে পত্র লিখিয়া লীলাবতীর অবস্থা পরিজ্ঞাত করাইবার সাহসও কাহার হইল না।

লীলাবতীও মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিত না। যখন অত্যন্ত প্রহৃত হইত, তখন অঞ্জনাকুমারের আদেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পাইত না— আহারাদি গৃহমধ্যেই করিতে হইত।

বিবাহের সময় মনোহরবাবু লীলাবতীকে যে সকল অলঙ্কার দিয়াছিলেন অঞ্জনাকুমার একে একে সেগুলিতে চক্ষুদান করিয়াছে। দুই একখানি গহনা মাত্র অবশিষ্ট আছে। অঞ্জনাকুমারের অদ্য তাহাই প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিবস লীলাবতী বাক্সের চাবি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অঞ্জনাকুমার অলঙ্কার চাহিলে, লীলাবতী "চাবি হারাইয়া যাওয়ার" কথা বলে। অঞ্জনাকুমারের তাহাতে বিশ্বাস হয় না। সে মনে করে, লীলাবতী অলঙ্কার দান করিতে অসম্মতা তন্নিবন্ধন এইরূপ মিথ্যা ভান করিতেছে। ইহার জন্যই প্রহার আরম্ভ হয়। অঞ্জনাকুমার সরোষে বলিল, "এখনও বল্‌ছি চাবি দে, নইলে আজ মেরে ফেলবো। দেখি তোর কোন্ বাবা রক্ষা করে।"

লীলাবতী জানু পাতিয়া করযোড়ে সরোদনে বলিল, "ওগো আমায় আর মের না—চাবি আমার কাছে নাই, নইলে দিতাম।" লীলাবতীর সমস্ত শরীর তখন ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

লীলাবতীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে অঞ্জনাকুমার তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিল। এবার নাসিকা ও দন্ত হইতে দরদর ধারে শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। কিন্তু মদমত্ত নরপশু অঞ্জনাকুমারের তদ্দর্শনেও তিলমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। লীলাবতী ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল—তাহার চৈতন্য অপহৃত হইল।

গত নিশায় অঞ্জনাকুমার অত্যধিক মদ্যপান করিয়াছিল। তাহার উপর বেশ্যা পীতাম্বরী অলঙ্কারের জন্য অত্যন্ত জুলুম করে, এমন কি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে বলে। পীতাম্বরীর আব্দার রক্ষার্থ মদিরামত্ত অঞ্জনাকুমার লীলাবতীর উপর এই অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত। পিতার নিকট হইতে সহজে টাকা পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা, সেজন্য সেদিকে প্রথমে চেষ্টা করে নাই।

লীলাবতীর সংজ্ঞাশূন্য ধূলিধূসরিত কায়া দেখিয়া অঞ্জনাকুমারের ভয় হইল। একবার মনে হইল, বুঝি লীলাবতীর প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ

করিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে ভাব তিরোহিত হইল। মূর্খ ভাবিল লীলাবতী ছলনা করিয়া পড়িয়া আছে। অমনই কোপানল দ্বিগুণতর প্রজ্জলিত হইল। পদাঘাতে লীলাবতীকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইল।

ঠিক এই সময়ে গৃহমধ্যে ত্রিশূলহস্তে এক ভৈরবীর আবির্ভাব হয়। ভৈরবীর সুন্দর ললাট সিন্দুরবিন্দুশোভিত, পরিধানে গৈরিক বসন, কুন্তল আলুলায়িত, রূপরাশিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত, নয়নপ্রান্ত হইতে তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সহসা ভৈরবীর আগমনে অঞ্জনাকুমার শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কালভয়নিবারণী মহামায়া আদ্যাশক্তি কি সরলা অবলার সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার পাপের পসরা বুঝি পূর্ণ হইয়াছে। মহিষাসুরের স্থায় দানবদলনী এখনই হয়ত ত্রিশূলাঘাতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিবে। আর রক্ষা নাই। অঞ্জনাকুমারের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, মাংসপেশী শিথিল হইল, ওষ্ঠদ্বয় বিবর্ণ হইল, চক্ষুঃ দৃষ্টিহীন হইল। সে ভয়ে “আ-মি না মে-রো না” বলিয়া বসিয়া পড়িল।

ভৈরবী ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে লীলাবতীর দেহযষ্ঠি উত্তোলন করিলেন, ধীরে ধীরে তাহা স্বকীয় স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ভৈরবীর চক্ষুর জ্যোতিতে অঞ্জনাকুমারের বাক্‌রোধ হইয়াছিল,সে যেন জাগিয়া ঘুমাইতে- ছিল। ভৈরবী কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিল না। সেই রজতশুভ্র জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত রজনীতে ভৈরবী শিরীষকুসুমপেলব দেহখানি বহন করিয়া জমিদার মনোহর বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা ত্যাগ করিলেন। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

তৃতীয় খণ্ড।

(১)

করুণাময়কে বক্ষে ধারণ করিয়া তরণী আপন মনে তরঙ্গিনীবক্ষে হেলিতে দুলিতে, নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে, তাহা সে জানে না। জীবনহীন অচেতন দারুময় তরণী সজীব মানবদেহ বহন করিয়া যাইতেছে—গন্তব্য স্থান কোথায় তাহা জানিবার উপায়ও নাই। মানুষও এমনই ভাবে ভবসাগরে কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গমন করিয়া থাকে। পঞ্চভূতাত্মক দেহতরীতে সচেতন জীবাত্মা আছে। তাহাই সে বহন করিয়া লইয়া যায়। কোথায় যায়, কাহার উদ্দেশে যায়, কে লইয়া যায়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। করুণাময়ের নৌকার ন্যায় দেহতরীকেও অনেকে কর্ম্মদোষে কাণ্ডারীহীন করিয়া থাকে। মায়ার ঘোরে, রিপুর দুর্দ্দমনীয় তাড়নায়, সেই ভবপারাবারের একমাত্র কাণ্ডারী ভগবানকে লোকে বিস্মৃত হইয়া যায়, ষড়রিপুর প্রেরণায় অধীর হইয়া অহংজ্ঞানে দিশেহারা হয়।

তরণীবক্ষে করুণাময় অচেতন। তাঁহার মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হয়। দস্যুরা ভাবিয়াছিল, প্রথমে করুণাময়কে স্বদলভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতে একান্তই সফলকাম না হয়, তাহা হইলেও অন্যরূপে তাহাদিগের বিশেষ লাভ হইবে। পুত্রের সন্ধান না পাইয়া, জমিদার মহাশয় পুত্রপ্রাপ্তির আশায়, বহু অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করিবেন। সেই অর্থ করতলগত হইলে তাহারা করুণাময়কে ছাড়িয়া দিবে। দস্যুরা ইহা মনে করিয়া করুণাময়কে ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর ঘটান আর। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। একজন দস্যু জলমগ্ন হইল, অন্যজন কোথায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কাহারও ভাগ্যে অর্থলাভ ঘটিল না, অথচ উভয়েরই পাপের মাত্রা বৃদ্ধি হইল।

গরুস্মতী একটী ঘাটে আসিয়া লাগিল। ঘাটে অনেক নরনারী ছিল। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ শিবপূজা করিতেছে, কেহ গা মুছিতেছে। নৌকখানি ঘাটে আসিয়া আবার অল্পদূরে গেল, অথচ নৌকাভ্যন্তর হইতে কেহ বহির্গত হইল না দেখিয়া সকলেই সবিস্ময়ে নৌকাখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। একজন স্নানার্থী যুবক সাহসে ভর করিয়া নৌকাখানি ধরিল। তীরসংলগ্ন করিবার পর দেখা গেল, একটী যুবক নিমীলিত নেত্রে অচেতন অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে। তাহার শিরোদেশ এক খানি বস্ত্রবিজড়িত। বস্ত্রের স্থানে স্থানে শোণিতচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। ঘাটে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যাহারা ঘাটে ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উঁকি ঝুঁকি মারিয়া নৌকার ভিতর দেখিতে লাগিল। কেহ বা ভাবিল, "হাঙ্গামায় গিয়া কাজ নাই। এখনই পুলিশ টানাটানি করিবে। শেষটা কি দায়ে পড়িতে হইবে ?" বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বাঙ্গলায় অধিক।

যাহারা পুলিশের ভয়ে ঘাট ছাড়িয়া পলায়ন করিল, তাহারাই নানা-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ঘটনাটীকে এরূপ আকার ধারণ করাইল যে, গ্রামের লোকে দলে দলে নদীতীরে আগমন করিতে লাগিল। অনেকেই বলিল, কেহ খুন করিয়া নৌকায় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। কেহ বলিল, লোকটা সদ্য মরে নাই, তাহা হইলে পচাগন্ধ বাহির হইবে কেন ?

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘাটে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তিনি পূজা সমাপনান্তে নৌকার ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নৌকারোহীর জীবনপ্রদীপ তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তবে গুরুতর আঘাতজনিত সংজ্ঞাহীনতা উপস্থিত হইয়াছে। তিনি গ্রামবাসী কতিপয় যুবককে আহ্বান করিলেন, একটা পাল্কীও আনাইলেন। সেই শিবিকায় করুণাময়ের দেহ ব্রাহ্মণের গৃহে নীত হইল।

করুণাময়ের চিকিৎসা হইতে লাগিল। পুলিশ যথাসময়ে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইল। তাহারা তখনই আহত

ব্যক্তিকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে চাহে। যে গ্রামের কথা বলিতেছি, তাহার নাম মহেশপুর। এই গ্রাম হইতে সদর হাসপাতাল আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী। অথচ আহত মুমূর্ষু করুণাময়কে লইয়া যাইবার জন্ত পুলিশ বিশেষ ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমনকি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মনকে নানারূপে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ক্রটী করিল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "বলিলেন,বাপু, এ তোমাদের কেমন বুদ্ধি? রোগীর যে অবস্থা তাহাতে এক ক্রোশ পথ লইয়া যাইতে না যাইতে শ্রান্তি ক্লান্তিতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। উহাকে আট ক্রোশ কি করিয়া লইয়া যাইবে?"

দারোগা বলিলেন "কি করিব ঠাকুর! আমরা আইনের চাকর। এটা পুলিশচালনী কেস, পুলিশের হেফাজাতে রোগীকে রাখিতেই হইবে। আইনের নড় চড় করিবার সাধ্য ত আমার নাই। তা' এতে রোগীর প্রাণ যাক্ আর থাক।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। পুলিশের অবিমৃষ্যকারিতার, অদূরদর্শিতার ফলে সময়ে সময়ে এরূপে রোগীর প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে। যাহা হউক, বাপু, আমি এ ব্রাহ্মণহত্যা জানিয়া শুনিয়া কিরূপে হইতে দিব। তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত কর, সিভিল সার্জ্জন আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া যদি হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে বলেন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

দারোগা অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণের পরামর্শমত কার্য্য করিতে সম্মত হইল। করুণাময়ের বোধ হয় পরমায়ুর জোর খুব বেশী, তাই এ যাত্রা দারোগা বাবুর সুবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি দেখিলেন, সম্ভবতঃই যদি করুণাময়কে আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী হাসপাতালে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে পথেই রোগীর প্রাণ বহির্গত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, চিকিৎসালয় পর্য্যন্ত পৌছান একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। দারোগা

বাবু পুলিশ সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিতে চলিয়া গেলেন। তবে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একজন চৌকীদার রাখিয়া যাইতে ভুলিলেন না।

পুলিশ সাহেব দারোগার রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কঠোরহৃদয় রাজপুরুষ ছিলেন না তিনি সিবিল সার্জ্জনকে মহেশপুরে যাইয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের কথামত সিবিল সার্জ্জন মহেশপুরে আগমন করিলেন। সেই সময়ে গৃহকর্ত্তার আহ্বানক্রমে গ্রামের ডাক্তার কৈলাস বাবুও তথায় উপস্থিত হন। কৈলাস বাবু মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার, তিনি ও সিবিল সার্জ্জন উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সদর হইতে সিবিল সার্জ্জনকে আনাইয়া চিকিৎসা করান সম্ভবপর নহে বলিয়া কৈলাসবাবুর চিকিৎসাধীনেই রোগীকে রাখা হইল। করুণাময়ের বাঁচিবার আশা যে অতি অল্প, উভয়েই একবাক্যে তাহা প্রকাশ করিলেন।

(২)

প্রাগুক্ত পরিচ্ছদে যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার একটু পরিচয় দিব। আর পরিচয় দিব মহেশপুর গ্রামের। গ্রামখানি হুগলী জেলার অন্তর্গত, জাহ্নবীতীরে অবস্থিত। প্রায় পাঁচ শত লোকের বাস। জাতি বিভাগ অনুসারে গ্রামখানি বিভক্ত। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, কাসারিপাড়া, ধোপাপাড়া প্রভৃতি আছে। বামুনপাড়ায় পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস। এই ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা আবার উল্লিখিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—নাম দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ। তিনি কুলীনচূড়ামণি— নবধাগুণশালী। ব্রাহ্মণ পূজা আহ্নিক লইয়া দিনাতিপাত করেন। গ্রামে কেহ অভুক্ত থাকিতে আহার করেন না। অতিথি সৎকারে সতত মুক্তহস্ত। গ্রামে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু আর নাই। একালের নব্য সম্প্রদায় এই কথায় হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া

"old fool" বলিয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে কাহারা "fool" পদবাচ্য, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। যাহারা পূজা আহ্নিক করেন না, তপ জপের ধার ধারেন না, ভগবদ্ভক্তির লেশমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, জাতি বিচার প্রভৃতিকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেন, ভিখারী অতিথি দ্বারে উপস্থিত হইলে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না, প্রতিবেশীর শুভাশুভের সংবাদ রাখেন না, দয়া দাক্ষিণ্যকে হৃদয়ে স্থান দেন না, খাদ্যের সহিত দেহের ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার করেন না, স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া থাকেন, আমরা তাহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। সুতরাং "ইঙ্গ বঙ্গের" চক্ষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপদার্থ জন্তু বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমরা তাঁহাকে দেবচরিত্র বলিতে ক্ষান্ত হইব না।

গ্রামের ব্রাহ্মণেতর জাতি এখনকার "হাল ফ্যাসান কলকাত্তাই ধরণে" ঊর্দ্ধ তুণ্ডে, মাত্র একহস্ত কিঞ্চিৎ উত্তোলনপূর্ব্বক প্রণাম বা 'গুড মর্নিং' করে না। ব্রাহ্মণ দেখিলে তাহার মেরুদণ্ড অবনমিত করিয়া প্রণিপাত করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সকলেই ব্যস্ত। কেবল ব্রাহ্মণ নহে, কুলীন কায়স্থ দেখিলে বাহাত্তর কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি জাতিও সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটী করে না। শ্রেণী বিভাগ অনুসারে সম্মান সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার যাহা জাতিগত ব্যবসা, সে তাহা করিয়া থাকে। এই সকল কারণে মহেশপুর গ্রামখানি দেখিলেই মনে হয়, লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, শান্তিদেবী পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা।

দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ নিকষ কুলীন, বন্দিঘাটী গাই। সংসারে ভার্য্যা দুর্গামণি ও কন্যা হিরন্ময়ী ব্যতীত আর কেহই নাই। পুত্র হয় নাই বলিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও তাঁহার ভার্য্যা সংসারের সকলকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়া থাকেন। কাঙ্গাল গরীব তাঁহাদিগের অধিকতর স্নেহাস্পদ।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সম্পত্তির আয়ও যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় হয় না, যত আয়, তত ব্যয়। কে কোথায় বুভুক্ষু আছে, কে কোথায় রোগশোকার্ত্ত আছে, স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তাহারই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। দুঃখীর দুঃখকাহিনী যখন তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, তখন অবিরল ধারে নয়নাশ্রু তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দেয়। কিসে দুঃখদারিদ্র্য, রোগ শোক বিমোচিত হইবে, ইহাই তাঁহার সতত চেষ্টা।

ভার্য্যা দুর্গামণিও স্বামীর অনুরূপ সহধর্ম্মিণী—উভয়েরই বসুধৈব কুটুম্বকম্। আর হিরণ্ময়ীর কথা? জনক-জননীর শিক্ষা দীক্ষা, কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার তাহার চরিত্রগঠনের প্রধান উপাদান হইয়াছিল। হিরণ্ময়ী বালিকাকুলশিরোমণি। কি রূপলাবণ্যে, কি চরিত্রগুণে, কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না।

এহেন সুখের সংসারে, পুণ্যের আগারে করুণাময় চিকিৎসার্থ নীত হইয়াছেন। করুণাময়ের চিকিৎসায়, সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী হইতেছে না। কৈলাস বাবু প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছেন। মাঝে মাঝে সিবিল সার্জ্জন করুণাময়ের সংবাদ লইয়া থাকেন।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিজের এবং তাঁহার বনিতা ও দুহিতার যত্নে ও সেবায় করুণাময়ের স্তিমিতপ্রায় জীবনদীপ যেন পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইতে লাগিল। এক সময়ে এমন হইয়াছিল যে, করুণাময়ের জীবনাশা সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা প্রসন্ন হইলে বিপদ আপনা হইতেই অপসারিত হয়। করুণাময় সে ধাক্কা সাম্‌লাইলেন, তাহার পর ক্রমে তাঁহার সুস্থতা-লাভের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, রোগ উপশমিত হইল। যতই দিনাতিপাত হইতে লাগিল, যতই করুণাময় আরোগ্যলাভ

করিতে লাগিলেন, ততই ব্রাহ্মণ পরিবারের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু একি? করুণাময় সুস্থ হইতেছেন বটে, অথচ তাঁহার দৃষ্টি যেন লক্ষ্যহীন হইতেছে? তাঁহার মুখে কোন কথা শুনা যাইতেছে না কেন? তবে কি করুণাময় উন্মাদ্ হইলেন? তবে কি তাঁহার বাক্‌শক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইল? কে বলিতে পারে, ভবিতব্যতায় কি লিখিত আছে?

চতুর্থ খণ্ড।

(১)

ভৈরবীর দেহে অপরিমিত বল। তিনি অবলীলাক্রমে লীলাবতীর দেহভার বহন করিয়া মনোহর বাবুর বাটী অতিক্রম করিলেন। নীরব নিস্তব্ধ নিশিথিনী। আকাশের গায়ে চাঁদ ভাসিয়া যাইতেছে। ঊর্দ্ধে গগনপট এবং নিম্নে ধরাতল যেন হাসিতেছে। প্রকৃতি সুন্দরীর সে মনোহর মূর্ত্তি দেখিলে দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়েও আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে সুরভিসম্ভার দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কুমুদদলশোভিনী পল্লী-সুন্দরী অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে।

ভৈরবী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গোপীনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভৈরবীর দীর্ঘবেণী নিতম্ব বহিয়া জানুদেশ পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে। গোপীনাথ মনোহর বাবুর দূরসম্পর্কে ভ্রাতা হইতেন। ভৈরবী গোপীনাথের বাটীর দ্বারদেশে সমাগতা হইয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন। গম্ভীরা যামিনী, সুষুপ্তা ধরণী। এরূপ সময়ে দ্বারে করাঘাত হওয়ায় গোপীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে প্রথমে কিছুই বলিল না, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। আবার আঘাত—আবার আঘাত। তখন সে শয্যা ত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে দ্বারসমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে ?"

উত্তর। বিষম বিপদ শীঘ্র দ্বার খোল।

গোপী। পরিচয় না পাইলে এত রাত্রিতে অকস্মাৎ কপাট খুলিতে সাহস হয় না।

"বাবা, আমি।"

গোপীনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া সত্বর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বলিল, "কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছিলাম, তবু সাহস হইতেছিল না। কি জানি, দুর্ব্বৃত্ত যদি আবার কোন চক্রান্ত করিয়া বিপদে ফেলে।"

ভৈরবী বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার পুনরায় অর্গলবদ্ধ হইল। ভৈরবী একেবারে গোপীনাথের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে লীলাবতীর মুর্চ্ছিত দেহ শয্যায় শায়িত করিলেন।

গোপীনাথ ও তদীয় ভার্য্যা সূর্য্যমুখী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "একি ?"

তখন ভৈরবী ধীরে ধীরে সকল কথাই বলিলেন। গোপীনাথ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মনোহর বাবু প্রথম হইতেই এ বিবাহে অসম্মত ছিলেন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! রোধ করে সাধ্য কার? এখন যা হ'বার তা' ত হয়েছে! মেয়েটা অজ্ঞান, নাক মুখ দিয়া রক্ত বেরিয়েছে—"

সূর্য্যমুখী তাড়াতাড়ি একটা পাত্রে খানিকটা জল আনিয়া দিল। লীলাবতীর মুখে চোখে কপালে জল দেওয়া হইতে লাগিল। ভৈরবী শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণের পর লীলাবতী চক্ষুরুন্মিলন করিল। তাহার মুখে, চক্ষে তখনও আতঙ্কের ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছিল।

লীলাবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া গোপীনাথ সূর্য্যমুখীকে তাহার শুশ্রূষা করিতে বলিয়া গৃহের বহির্ভাগে উপস্থিত হইল। ভৈরবীও নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

ভৈরবীকে গোপীনাথ বলিল, "এখন উপায়? রামধন বাবু ও তাঁহার পুত্র যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত, তাঁহারা একথা শুনিতে পাইলে আমার

আর পরিত্রাণ থাকিবে না। এমন অবস্থায় লীলাবতীকে ত্যাগ করাও অসম্ভব। বিষম সমস্যার কথা—"

ভৈরবী বলিলেন, "বাবা, সৎকার্য্যে ভগবান সহায় হ'ন। ভয় করিবেন না। আপনার অমঙ্গল হইবে বুঝিলে আমি এখানে লীলাবতীকে আনিতাম না। পাষণ্ড অঞ্জনাকুমারের আয়ত্তে থাকিলে কোন্ দিন লীলাবতীর প্রাণ যাইবে। তাই তাকে নিয়ে এসেছি।"

গোপী। তুমি যা' ব'লছো, সবই সত্য। বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্ন বহু দিন খাইয়াছি। জীবন দিয়াও তাঁর কন্যাকে রক্ষা ক'রতে হ'বে। তবে কি না—দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার করা শাস্ত্রের কথা।

ভৈরবী। আচ্ছা! মুখুর্জ্জে মহাশয় কোথায় আছেন বল্‌তে পারেন?

গোপী। আজ দশ দিন হ'ল, তাঁর পত্র পাই নাই। শেষ চিঠিখানা বৈদ্যনাথ থেকে লিখেছিলেন।

ভৈরবী। তবে ত বাড়ীর কাছে এসেছেন!

গোপী। তা'তে কি?

ভৈরবী। এ সকল কথা বোধ হয় তাঁর কর্ণগোচর হয় নি।

গোপী। বোধ হয় না। কা'র কাঁধের ওপর দুটা মাথা আছে যে, রামধনের বিরুদ্ধে তাঁকে পত্র লিখ্‌বে? বিশেষতঃ তিনি এখন একরকম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই হয়েছেন; বিষয়বাসনা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি তাঁর হৃদয়কে বোধ হয় আর উদ্বেলিত কত্তে পারে না। অন্ততঃ তাঁর পত্রাদি পড়লে তাই বুঝা যায়।

ভৈরবী। বাবা! আমি কয়েকদিন আর আসবো না। আপনি লীলাবতীকে যত্নে রক্ষা করিবেন। লীলা যে আপনার বাড়ীতে আছে, এ কথা কোনমতে যেন প্রকাশ না পায়। আমি যত সত্বর পারি ফিরে আসবো।

ভৈরবী এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি অদৃশ্য হইলেন। গোপীনাথ বহির্দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

(২)

রামধন বাবু পুত্রের চরিত্র জানিতেন। পুত্রের সম্বন্ধেই মনোহর বাবুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, পুত্রের জন্যই তিনি মনোহর বাবুর বৈভবের অধিকারী। কাজেই পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি আদৌ কথা কহিতে সাহসী হইতেন না। বরং পুত্রের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন ও প্রয়াস করিতেন। কেবল রামধন বাবু নহে—অনেক দুর্ব্বলমনা পিতাকেই এরূপ হইতে দেখা যায়। পুত্রকে ধনীর পোষ্যপুত্র করিয়া দিয়া পিতা সেই সংসারে কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এবংবিধ পুত্রের হস্তে পিতার নানারূপ লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। পুত্র প্রভু, পিতা ভৃত্য। এরূপ দৃশ্য বিরল হইলেও অভিনব নহে।

অঞ্জনাকুমার ঘোর কুক্রিয়াসক্ত হইয়াছে, সুচতুর রামধন যে তাহা জানিতে পারেন নাই, তাহা নহে। অঞ্জনা লীলাবতীর অলঙ্কারাদি নষ্ট করিতেছে, বলপূর্ব্বক খাজাঞ্চীর নিকট হইতে অর্থাদি গ্রহণ করে, এ সকল রামধনের অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে নীরব, নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়। প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? তবে সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে!

যে রাত্রিতে লীলাবতী অত্যন্ত প্রহৃতা হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে, ভৈরবী আসিয়া লীলাবতীকে লইয়া যায়, সেই রাত্রিতে অঞ্জনাকুমারের সহিত রামধন বাবুর বচসা হয়। ভৈরবী লীলাবতীকে লইয়া যাইবার পর অঞ্জনা কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে পিতার শয়ন-প্রকোষ্ঠে গমন করে। অঞ্জনার মুখে মদিরার প্রবল গন্ধ, পা টলিতেছে, মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ। অঞ্জনা জড়িত কণ্ঠে বলিল—"বেশ বাবা, ঘুমাও—তোমার বৌ যে শিকলি কেটেছে—"

রামধন বাবু এই প্রহেলিকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। সক্রোধে বলিলেন "তোর পাখা উঠেছে, মরণ বাড় বাড়িয়েছিস—দূর হ—"

অঞ্জনা। তা আর পার্‌লাম কৈ বাবা! বাড়তে পারলে পীতাম্বরী কি এত রাত্রে তাড়ায়—না বৌ পালায়—?"

রামধন। সে কিরে বানর? বৌ পালিয়েছে কি?

অঞ্জনা। তবে আর বলছিলুম কি? সে শিকলি কেটেছে এখন দাও বাবা কিছু টাকা, নইলে পীতাম্বরী ঝাঁটা মেরে বিদায় করবে। বৌ থাক্‌লে কি তোমার কাছে টাকা চাইতুম? যে মার ধরেছিলুম, তাতেই তার যা কিছু গয়না আছে ফেলে দিত, আজ রাতটা চলে যেত।

রামধন বাবুর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। যেমন গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইতে যাইবেন, অমনি অঞ্জনাকুমার দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইল—বলিল, I is the here, you is the go? Then who is the money give? "কোথা যাবে বাবা—টাকা দাও তবে ছাড়বো,

নইলে নয়! দানবনন্দিনী আমি—কেমনে ছাড়াব সেই ভিখারী রাঘবে?"

রামধন বাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি অঞ্জনাকুমারকে পদাঘাত করিলেন। পুত্রও ছাড়িবার পাত্র নহে—পিতাকে আক্রমণ করিল! তখন উভয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ মল্লযুদ্ধের পর প্রমত্ততাপ্রযুক্ত অঞ্জনাকুমার পরাজিত হইল। রামধন বাবু সুযোগ পাইয়া সত্বর গৃহ হইতে সরিয়া পড়িলেন। তখন সমস্ত ঘটনা গোপন করিবার মানসে শিবিকা আনাইয়া লীলাবতীর শ্বশুরালয়ে গমনের সংবাদ প্রচার করিলেন। পাছে অকস্মাৎ লীলাবতীর শ্বশুরালয়ে গমন সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হয়, তন্নিবন্ধন প্রচার করা হইল যে, শ্রীমতী বৃকোদরী বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়াছে; তাহাতেই লীলাবতীর তথায় গমনের প্রয়োজন হইয়াছে। কেহ সংবাদটা বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না। সন্দেহের একটা বিশেষ কারণ এই হইল, রামধন বাবু অথবা অঞ্জনাকুমার কেহই গমন করিল না কেন?

রামধন বাবু এইদিকে নানাস্থানে লীলাবতীর অনুসন্ধানার্থ গোপনে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কেহই কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। তিনি চিন্তিত হইলেন। কি বলিয়া মনোহর বাবুকে লীলাবতীর অন্তর্ধানের কথা বুঝাইয়া দিবেন, তাহাই স্থির করিতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রের বিদ্যা চরম সীমায় উঠিয়াছে। তাহাও লজ্জার একটা কারণ। আবার গোপীনাথ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর উপর অযথা অত্যাচার, প্রজা-পীড়ন, অর্থ আত্মসাৎ প্রভৃতি সকল কথা একে একে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে একটা

যেন ভীষণ যুদ্ধ মনোমধ্যে হইতে লাগিল। যুদ্ধে হৃদয়টা ক্ষত বিক্ষত হইল। অবশেষে যখন দেখিলেন, যে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, তাহা গোপন করিবার উপায় নাই, তখন তিনি সয়তানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। মানুষ এমনই হইয়া থাকে। পাপপুঞ্জ যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অহরহঃ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে, যখন উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না, তখন মানুষ বাধ্য হইয়া নাস্তিক হয়, পাপ পুণ্য মানে না—কথায় কথায় বলিয়া থাকে, "পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব নাই—উহা চিত্তবিকারমাত্র।" পাপের এমনই বিচিত্র লীলা!

রামধন বাবু যখন দেখিলেন, মনোহর বাবুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ই নাই, তখন মনোহর বাবুকে হীনবল করিবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইল, গোপীনাথের নিধন সাধন। দ্বিতীয় প্রয়াস, প্রজাবৃন্দকে বিদ্রোহী করা। গোপীনাথ মনোহর বাবুর দক্ষিণ হস্ত। আর প্রজাবর্গ যদি খাজনাদি না দেয়, তাহা হইলে মনোহর বাবু অর্থাভাবে আর তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। রামধন বাবু ইহাই সদ্‌যুক্তি বলিয়া স্থির করিলেন। কার্য্যাদিও তদনুরূপ হইতে লাগিল। এ ব্যাপারে কালীনাথ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান সহায় হইল।

(৩)

আশ্বিন মাস। দিবা দ্বিপ্রহরে দুস্তর প্রান্তরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মারুত হিল্লোলে ধান্যক্ষেত্রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিতেছে—মনে হইতেছে যেন তাপলহরী মস্তকে করিয়া

খাগুশীর্ষগুলি ছুটিতেছে। প্রান্তর বহু দূর বিস্তৃত—কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে বৃক্ষপুঞ্জ তাপদগ্ধ পথিককে ছায়া প্রদানার্থ যেন শাখা প্রশাখা বিলোড়িত করিয়া আহ্বান করিতেছে। বিহঙ্গমকুল পত্রাবলীর মধ্যে অবস্থান করিয়া ভানুকরকে বিদ্রূপ করণার্থ যেন কাকলী করিতেছে।

এরূপ সময়ে প্রান্তর মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া একখানি শিবিকা বাহিত হইতেছে দেখা গেল। শিবিকার অগ্র পশ্চাতে দীর্ঘ লগুড় হস্তে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে যমদূতসম চারিজন পাইক ছুটিয়াছে। চারিজন বাহক শিবিকা বহিতেছে, আর চারিজন সমভিব্যাহারে যাইতেছে। তাহাদিগের হস্তেও ক্ষুদ্র যষ্টি।

দেখিতে দেখিতে এক বাপিতটে বৃক্ষমূলে শিবিকাখানি বাহকেরা নামাইল। বাহকেরা কেহ তাম্রকূট সেবনে ব্যস্ত হইল, কেহ বা গামছা খানি ঘুরাইয়া নিজেকে নিজে বীজন করিতে লাগিল, কেহ পুষ্করিণীতে হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থ অবতরণ করিল।

একটী পাইক তামাকু সাজিয়া শিবিকার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। শিবিকার ভিতরে গোপীনাথ বসিয়াছিলেন। তিনি পাইকের হস্ত হইতে কলিকা লইলেন। পাইক শিবিকার নিকট বসিল। গোপীনাথ বলিলেন, "মহেশ, আজ রৌদ্রের ভারি তেজ। তোমরা একটু বিশ্রাম কর। কিন্তু এটা মনে রেখো, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের বর্দ্ধমানে পৌঁছিতে হইবে।"

মহেশ। তা পৌঁছাব হুজুর! তবে লোকগুলা একটু ঠাণ্ডা না হ'লে আর যেতে পারবে না।

গোপী। তা হ'ক। রৌদ্রে ওদের ভারি কষ্ট হয়েছে। কি করবো বাপু, সরকারী কাজ, নইলে এমন সময়ে কি কেউ ঘরের বাহির হয়?

মহেশ। হুজুর—আমরা মুরুখু মনিষ্যি, একটা কথা বুঝতে পারি না।

গোপী। কি?

মহেশ। বাবুর বেয়াই আপনার উপর অত জুলুম করেন, আর আপনি কোন কথা ক'ন না, সমানে মান্সি করেন, এর মানে কি? আমরা হ'লে ত পারতুম না।

গোপী। বল কি মহেশ? রামধন বাবু একে হুজুরের প্রতিনিধি, তাতে আবার কুটুম্ব। তাঁর জুলুম অত্যাচার সহ্য না ক'রলে যে প্রভুদ্রোহী হ'তে হয়।

মহেশ। হুজুর। আমরা চাষা লোক, আমাদের কি এত বুদ্ধি সুদ্ধি আছে? আমরা বুঝি, এক হাতে তালি বাজে না। আমরাও ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রবো, আর হুজুরেরাও স্নেহ মমতা করবেন, তবেই দেখায় শুনায় ভাল। নইলে আপনারা সুধু ব'লবেন, ভক্তি শ্রদ্ধা কর, আর ফাঁকা পিঠ চাপ্ড়াবেন, আর আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রবেন, আমরা চুপ ক'রে বসে থাকবো, তাও কি কখন হয় হুজুর?

গোপী। বাপু, আমরা হিন্দু। আমরা অদৃষ্ট মানি। আর মানি ধর্ম্ম। কনিষ্ঠের ধর্ম্ম-কর্ত্তব্যকর্ম্ম, জ্যেষ্ঠকে সম্মান ভক্তি করা, তা জ্যেষ্ঠ অত্যাচারীই হউন, আর প্রপীড়কই হউন। আমরা চাকর, মনিবের নেমক খাই। মনিবের গুণ গাইতে, আদেশ পালন করিতে আমরা বাধ্য। রামধন বাবু যে আমাকে আদৌ

দেখ্‌তে পারেন না, তা তাঁর প্রত্যেক কার্য্যে প্রকাশ পায়; আমার সর্ব্বনাশ করা যে তাঁর প্রবল ইচ্ছা, তাও বুঝি। তিনি ভণ্ডামী করিয়া আমার সামনে অন্য লোকের নিকট আমার নানারূপ প্রশংসা করেন, তাও শুনেছি। কিন্তু করব কি? দণ্ড দিবার ক্ষমতা ত আমার হাতে নয়?

মহেশ। হুজুর ও সুখ্যাতির মানে আর কিছু নয়, কাজ আদায় করা। কাজের সময় সুখ্যাতি, কিন্তু অন্য সময় লাথি। বাবুর বেয়াইয়ের আগাগোড়া এই ব্যবহার।

গোপী। লোকটা বিষম চক্রী। কিন্তু বাপু জেন, রামধন বাবু যেমনই লোক হউন্, আমরা তাঁর অধীন, সুতরাং তাঁকে মানতে হ'বে।

মহেশ। আমরা হুজুর ও সব বুঝি না। মুখে এক, পেটে আর, আমাদের ভাল লাগে না। ও রকম লোকের নিধন হ'লেই মঙ্গল।

গোপী। বাপু, কাহারো অশুভ কামনা ক'রতে নাই। যা হ'ক, তোমার যেরূপ মনের ভাব দেখছি, তা বাপু অন্যের কাছে প্রকাশ ক'রো না। কি জানি, কার মনে কি আছে। কেউ যদি বলে দেয়, তা'হলে আর রক্ষা থাকবে না।

মহেশ। হুজুর তাই হবে। মুখে রাবণের জয় গাব, আর মনে মনে রামের জয় ব'লবো।

গোপী। হাঁ বাপু, যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে সত্যের মর্য্যাদা রাখা দুরূহ। ভণ্ডামীটা লোকজনকে যেন জোর করে শিখ্‌তে হ'য়। এই মিথ্যা ভানকে পাশ্চাত্য জাতিরা আবার policy বলিয়া থাকেন! যিনি যত policyবাজ, তিনি তাদের ভিতর ততই চতুর বলে পরিচিত।

মহেশ। হুজুর! এসব আপনারা ইঞ্জিরী পড়েছেন, আপনারাই জানেন। আমাদের কিন্তু এ সব কথা শুনে পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে যায়।

গোপী। তা যাবে বাপু। বেঁচে থাক্‌লে, দিন দিন আরও কত নূতন কথা শিখবে। তোমরা বোধ হয় জান, ধর্ম্মটাই এ সংসারে সকলের আগে। কিন্তু বাপু, যেরূপ দিন কাল পড়েছে, তাতে সে কথাটা এখন চাপা পড়েছে। আগে আমাদের দেশে যুদ্ধাদি কার্য্যেও ধর্ম্মভাব সমাহিত ছিল। অধর্ম্ম যুদ্ধ করলে লোকে নিন্দার পাত্র হ'ত। নিরস্ত্র শত্রুকে অস্ত্রাঘাত করা কাপুরুষতার লক্ষণ ছিল। নাভিদেশের নিম্নভাগে অস্ত্রাঘাত করা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ বলে বিবেচিত হত না। ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুদেশে গদাঘাত করেছিলেন বলে, বলরাম তাঁহার নিন্দা করেছিলেন। তার পর, মহাবীর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা দেখ। স্ত্রীলোক ত দূরের কথা, ক্লিবের বিরুদ্ধেও তিনি অস্ত্রধারণ করিতেন না। ইহার জন্য তিনি মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে বিমুখ হ'ন নাই। এ সকলের অর্থ কি জান বাপু? দুর্ব্বলদলন তখন অধর্ম্মাচরণ বলিয়া গণ্য হ'ত। যে দেশে ধর্ম্মের ভাব এতাদৃশ প্রবল ছিল, সে দেশের লোক ম্লেচ্ছাদির আক্রমণে অন্যায় সমরের অবতারণা দেখিয়া যে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন, বিচিত্র কি? এদেশে হিন্দু রাজত্বের বিলোপের অন্যতম কারণ এই ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য। আক্রমণকারী যবনেরা অন্যায় যুদ্ধ করলেও, হিন্দুরা হীনকৌশল অবলম্বন করেন নাই, কাজেই হৃতসর্ব্বস্ব হন। ধর্ম্ম আমাদের অস্থিমজ্জায় আছে। নিতান্ত পামর ব্যতীত কেহই সহজে ধর্ম্মত্যাগ করিতে চাহিতেন না। আমাদের যাঁরা প্রভু, তাঁরা সর্ব্বপ্রকারে আমাদের নিগ্রহ করলেও

আমরা মুখ ফুটিয়া তাঁদের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারি না। কহিলেই অপরাধী হইতে হয়। এখন বুঝলে কি?

এমন সময় একটী বৃক্ষোপরিস্থ পত্রান্তরাল হইতে শন্ শন্ শব্দে একখণ্ড কাষ্ঠফলক আসিয়া মহেশের ললাটদেশে সজোরে পতিত হইল। মহেশের মাথা ফাটিয়া গেল, অজস্রধারে শোনিত নির্গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও চারিটা কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতে অবশিষ্ট তিনজন লোক ও একজন শিবিকাবাহক আহত হইল। তখন অন্যান্য বাহকেরা সভয়ে পলায়নপর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দুইটা বৃক্ষ হইতে বার জন লোক অবতরণ করিয়া লগুড়হস্তে শিবিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

গোপীনাথ তখন বিপদ গণিলেন। একাকী দশ জন দস্যুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভবপর নহে দেখিয়া তিনি শিবিকায় নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন। দস্যুরা আসিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ স্থাণুবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। দস্যুরা অবশেষে তাহার মুখ বাঁধিল, পিছমোড়া করিয়া পাল্কীর সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিল। লুণ্ঠন ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইলে দস্যুগণ পলায়ন করিল। গোপীনাথ বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া সেই ঘোর দুরন্ত প্রান্তরে অবস্থান করিতে লাগিল।

দস্যুদের পলায়নের বহুক্ষণ পরে বাহকেরা একে একে পুনরায় উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা গোপীনাথের বন্ধন মোচন করিল। গোপীনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অন্যান্য বাহকেরা চৈতন্যরহিত বাহকদিগের শুশ্রূষায় রত হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের পুনরায় চৈতন্য হইতে লাগিল। তখন গোপীনাথ পাল্কী ফিরাইতে বলিলেন। তিনি অষ্টমের খাজনা দাখিল

করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। আর কি দিয়া খাজনা দিবেন? অষ্টমের টাকা জমা দিবার শেষ দিন আগামী কল্য। তাহা হইবার আর সম্ভাবনা নাই। বেলেডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার টাকার যোগাড় করিয়া অষ্টম রক্ষা করা অসম্ভব। গোপীনাথ তাহা বুঝিলেন। তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল।

ইহার উপর আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই দস্যুতা যে রামধনের ষড়যন্ত্রে হয় নাই, তাহাই বা কে বলিল? রামধন বাবু ইদানীং তাহার উপর অধিকতর বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি একখানি জাল দানপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দানপত্রের মর্ম্ম, মনোহর বাবু তাঁহার পুত্রের সন্ধান না পাইয়া এবং জামাতাকে সর্ব্বগুণান্বিত দেখিয়া সমস্ত সম্পত্তি দান করিতেছেন। এই দানপত্রে মনোহর বাবুর স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছিল। গোপীনাথকে সাক্ষী হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অর্থের প্রলোভন দেখাইতেও ক্রটী করা হয় নাই। গোপীনাথ কিন্তু কিছুতেই এই পাপকার্য্য করিতে সম্মত হয় নাই। তজ্জন্যই কি রামধন বাবু এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন?

অথবা লীলাবতীর অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়াছেন? তাহা হইলেও ত সর্ব্বনাশ। তাহার আর রক্ষা নাই। রামধন বাবুর সম্ভবতঃ এই সকল কারণে তাহাকে বিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। হয় ত ইহার ফলে তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইতে হইবে। হয় ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কারারুদ্ধ হইতে হইবে। কে জানে ইহার ফলে কি ঘটিবে? দুষ্টের ছলনার ত অভাব নাই।

গোপীনাথ এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বেলেডাঙ্গার অভিমুখে চলিল। পথে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই রামধম বাবুর চর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বিপদাশঙ্কায় দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। গোপীনাথের বদন বিশুষ্ক, চক্ষু কোটরগত। যেন কত গুরু অপরাধ করিয়াছে। শঙ্কিত হৃদয়ে মনোহর বাবুর প্রাসাদতুল্য ভবনে প্রবেশ করিল।

শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। তথায় রামধন বাবু কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গোপীনাথকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপীনাথ ফিরিলে যে ?"

তখন গোপীনাথ সাশ্রুনয়নে একে একে সকল কথাই বলিল। গোপীনাথের বাক্যাবসানে রামধন বাবু রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ গোপীনাথ, বিষয় কর্ম্ম করিয়া আমরা বুড়া হইয়াছি। তোমার চালাকী যে আমরা বুঝিতে পারিব না, তাহা মনে করা অন্যায়। তুমি মনোহর বাবুর বহুদিনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়াই তোমাদ্বারা এই অর্থ পাঠাইয়াছিলাম। তুমি যে শঠ, প্রবঞ্চক, পরস্বাপাহারী, আমি তাহা বহুদিবস যাবৎ জানি। কিন্তু কি করিব, মনোহর বাবুর জন্য তোমার বদমায়েসী ভাঙ্গিতে—তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে—পারি নাই। কিন্তু সহিষ্ণুতারও ত একটা সীমা আছে। আর সহ্য হয় না। তুমি প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া স্বীয় উদরপুরণের নিমিত্ত এই অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছ, এখন একটা বৃথা ভান করিয়া এরূপ বলিতেছ। তোমাকে আমি এবার সমুচিত শিক্ষা দিব।"

এখনই তোমাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিব। তোমার আর নিস্তার নাই।"

গোপীনাথ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সে করযোড়ে নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। যথাসময়ে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইল। গোপীনাথ পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইল। গোপীনাথের বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

(৪)

গোপীনাথের অপরাধ সম্বন্ধে পুলিসের তদন্ত চলিতে লাগিল। গোপীনাথ পুলিশ হস্তে ধৃত, তাহার বাড়ীতে অন্য অভিভাবক আর কেহ নাই। সুতরাং তাহার মোকদ্দমার তদ্বির করিবার লোকাভাব। তাহার উপর পূর্ণমাত্রায় অর্থাভাব। পক্ষান্তরে রামধন বাবু স্বয়ং প্রতিপক্ষ হইয়া পুলিস-তদন্তের সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার লোকাভাব বা অর্থাভাব কিছুই নাই। ফৌজদারী মোকদ্দমায় এই দুইটারই বিশেষ প্রয়োজন। রামধন বাবুর অভীষ্ট সিদ্ধির সমস্ত সুযোগই সমুপস্থিত।

পুলিস তদন্তে অপহৃত নোটের দুই চারি খানি গোপীনাথের বাড়ী হইতে বাহির হইল। আর বাহির হইল—লীলাবতী। লীলাবতীর সম্বন্ধে রামধন বাবু পুলিসকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিলেন। পুলিস লীলাবতীর কথা প্রকাশ করিল না। লীলাবতীকে গোপনে রামধন বাবু বাটীতে লইয়া গেলেন।

তদন্তের ফলে গোপীনাথের নির্য্যাতনের পরিসীমা রহিল না। তাহার সম্মুখেই তাহার ভার্য্যার অবমাননার একশেষ হইল। কুলবধূর লাঞ্ছনা চক্ষের সম্মুখে হইলেও রামধন বাবু বা তদীয় পুত্র

কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না, বরং তদন্তকারী কর্ম্মচারীকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামধন বাবু একবার অন্তের অলক্ষ্যে গোপীনাথের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া অনুচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন, "দানপত্রে স্বাক্ষর কর, এখনই গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।"

গোপীনাথ বলিল, "প্রাণ থাকিতে নহে।" রামধন বাবু আর কিছুই বলিলেন না। তিনি তদন্তকারী কর্ম্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথের বাক্স পেট্‌রা ভাঙ্গিতে বলিলেন, তৈজস পত্রাদি লণ্ড ভণ্ড করিয়া তদন্তের চূড়ান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। রামধন বাবুর ইচ্ছামতই কার্য্য হইল। তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী গোপীনাথকে অকথ্য গালি দিতে ক্ষান্ত হইল না। বিশেষতঃ গোপীনাথের বাড়ী হইতে যখন অপহৃত অর্থের কিয়দংশ বাহির হইয়াছে, তখন ত আর রক্ষা নাই। পুলিশ কর্ম্মচারী বলিল, "এমনই ভদ্র বেশধারী ভণ্ড সংসারে অনেক। প্রভুর অর্থ অপহরণে যাহারা সঙ্কুচিত হয় না, তাহাদের নরকেও স্থান নাই। ইহকালের দণ্ডভোগ ত এখনই আরম্ভ হইবে—হাজতে পচিতে হইবে, তাহার পর জেল। চৌকীদার, হাতকড়ি লাগাও—থানায় লে চল।" গোপীনাথের কথা বাহির হইল না—কেবল দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড।

(১)

"বাবা, আর যে পারি না। পরীক্ষা কত দিনে শেষ হবে?" জনৈক সন্ন্যাসীকে এক ভৈরবী এই প্রশ্ন করিলেন।

সন্ন্যাসী। "মা, তোমার পরীক্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও অনেক বাকী।"

ভৈরবী হেটমুণ্ডে রহিলেন। সন্ন্যাসী দেখিলেন, ভৈরবীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিতেছে। বলিলেন, "যদি কাতর হও, যদি প্রফুল্ল মনে সংসারের সেবা করিতে না পার, তাহা হইলে এ বেশ পরিত্যাগ কর। যে শ্মশান-বিহারী যোগীশ্বরের সেবাদাসী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে চাহে, যাহার ললাটে ত্রিপণ্ড্রক, সীমন্তে সিন্দুর, গলে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তে ত্রিশূল, তাহার চিত্তে স্বার্থপরতার কণামাত্র থাকা উচিত নহে। মা, তোমাকে বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি তোমার চরিত্রবল আছে জানিয়াই তোমাকে ভৈরবী হইবার অনুমতি দিয়াছিলাম। বহু দিবস যাবৎ তোমার চরিত্র পরীক্ষা করিতেছি। যখন কষিত কাঞ্চন বলিয়া উপলব্ধি হইল, তখনই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইতস্ততঃ করি নাই। কিন্তু আজ তোমার একি ভাব? দেখিতেছি, তোমার চিত্ত এখনও নির্ম্মল স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হয় নাই। এখনও স্থানে স্থানে মলিনতার চিহ্ন রহিয়াছে।"

ভৈরবী। বাবা, অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। সংসারের কোন প্রকার সুখ দুঃখই আমাকে অভিভূত করিতে

পারে না। কিন্তু এক বিষয়ে আমি চিত্তকে সংযত করিতে পারি না। বাবা—বাবা—যখন তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলে ভাবিতে না পারি—যখন মনে হয়, আমার সর্ব্বস্ব যিনি, তিনি কোথায়, তখনই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না। জানি না, কোথা হইতে প্রেম-প্রস্রবন প্রবাহিত হইতে থাকে—দুঃখশোকে প্রাণটা আকুলি ব্যাকুলি করিতে থাকে। বাবা, এ দুর্ব্বলতা কি অমার্জ্জনীয়?

ভৈরবীর কথায় সন্ন্যাসীরও যেন একটু চিত্তচাঞ্চল্য সমুপস্থিত হইল—ধীর স্থির প্রশান্ত বারিধীবক্ষঃ যেন নিমেষের নিমিত্ত একবার সামান্যরূপ বিক্ষুব্ধ হইল। মনে হইল যেন সন্ন্যাসীর নেত্রদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; কিন্তু সে ভাব ক্ষণেকের মধ্যেই বিলুপ্ত হইল। তিনি বলিলেন "মা, জানি মায়া অবিদ্যারূপিনী, মায়াতে জীবগণ আবদ্ধ। মায়াপাশ ছেদন করা অতীব দুরূহ। তোমার হৃদয়ের যে স্থানে ক্ষত আছে, তথায় আঘাত লাগিলেই যে যন্ত্রণার উদয় হইবে, তাহাও বুঝি; কিন্তু তথাপি মা, চিত্তকে যথাসাধ্য স্থির করিতে হইবে। মানুষ সমগ্র জগতকে যখন আপনার মত ভাবিতে পারিবে, যখন 'শিবোঽহং' তত্ত্বের রহস্য অবগত হইবে, তখন সে কর্ম্মকাণ্ডের বহির্ভূত হইবে—সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, কিছুরই প্রভাব অনুভব করিবে না। ইহাই জ্ঞানের চরমাবস্থা—যোগের পূর্ণ ফল। মা—যতদিন তোমার হৃদয়ের এই ক্ষতটুকু না সারিতেছে, ততদিন কর্ম্ম তোমার অপরিহার্য্য। সুতরাং তুমি কর্ম্ম হইতে এখনও অবসর পাইবার যোগ্যা হও নাই।"

ভৈরবী। বাবা, বড় কঠিন কথা। ইহজগতে যিনি পরম দেবতা বলিয়া গণ্য, যাঁহার চরণপ্রান্তে মনঃপ্রাণ সমর্পণ

করিয়াছিলাম, যাঁহাকে সর্ব্বগুণময় দেখিতাম—যাঁহার রূপরাশি আমার চক্ষে কন্দর্পনিন্দিত বলিয়া প্রতিভাত হইত, তাঁহাকে এত সহজে বিস্মৃতির অতলজলে কি করিয়া নিক্ষেপ করিতে পারিব?

সন্ন্যাসী। সে কে? তুমি তাহাকে পঞ্চভূতাত্মক দেহ-বিশিষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতেছ কেন? কেন ভাবিতেছ, তাহার সত্তা বিলুপ্ত হইয়াছে? জীবাত্মার কি জন্ম মৃত্যু আছে? ইনি শস্ত্রে ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদযুক্ত (গলিত). বায়ুতে শোষিত হন না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, (স্থির স্বভাব) অচল (পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী) সনাতন। ভগবান আরও বলিয়াছেন—

যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না, এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

ভৈরবী। বাবা, এত বড় কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই।

সন্ন্যাসী। তাইতেই ত বলিতেছি, কর্ম্মপাশ এখনও ছেদন করিতে পার নাই—তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

ভৈরবী। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। এখন আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন?

সন্ন্যাসী। তুমি লীলাবতীর উদ্ধার সাধন করিয়াছ, মনে করিতেছ। কিন্তু তাহা হয় নাই। লীলা পুনর্ব্বার পিতৃভবনে নীত হইয়াছে। এবারে কেবল অঞ্জনাকুমার নহে, রামধনও তাহার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লীলার প্রহরায় তাহার শ্বশ্রূ নিযুক্তা, এদিকে গোপীনাথ ফৌজদারী

আদালতে অভিযুক্ত। গোপীনাথ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য আমি করিব। তোমাকে এখান হইতে কাশী যাইতে হইবে। তথায় যাইয়া যাহা করিতে হইবে, তাহা তুমি নিজেই পরে জানিতে পারিবে। কাশী হইতে তোমাকে পুনর্ব্বার এখানে আসিতে হইবে।

ভৈরবী। তবে লীলাবতীর উপায় কি হইবে?

সন্ন্যাসী। আবার তুমি "অহমিকায়" অন্ধ হইতেছ? তোমার উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত হইতেছে, তুমি কর্ম্ম করিয়া যাও। তুমি কি কোন কর্ম্মের নিয়ন্তা?—না, তুমি কাহারও উদ্ধারকর্ত্রী?

ভৈরবী। বাবা, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলের আশা স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম আকাশ-কুসুমবৎ প্রতীয়মান হয়। লীলার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিলে কি ফলোদয় হইবে না?

সন্ন্যাসী। এইখানেই দুঃখ। সুখ দুঃখ বৃক্ষের ফল নহে,—আশাতে উহার উৎপত্তি। আশা পূর্ণ হইলেই সুখ হয়, ভঙ্গ হইলেই দুঃখ হয়। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়।" তুমি কর্ম্মফলের আশা করিও না।

ভৈরবী। বাবা, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার কি উপায় নাই?

সন্ন্যাসী। বৎসে, বর্ণপরিচয় না হইলে কি ভাষাশিক্ষা হয়? সোপান অতিক্রম না করিলে দ্বিতলে ত্রিতলে কি যাওয়া যায়? কর্ম্মই জীবের প্রথম অনুষ্ঠান, তাহার পর ভক্তি, তৎপরে জ্ঞান। গীতাতেও এই পর্য্যায়ভেদে উপদেশ-ভেদ আছে। কেবল গীতাই বা বলি কেন? নিখিল সনাতন শাস্ত্র এই একই মার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছেন। তন্ত্রেও পশ্বাচার, বীরাচার ও দেবাচার এই মার্গভেদের

ব্যবস্থা। তমঃ, রজঃ ও স্বতঃ গুণ, এই অবস্থাভেদে উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভৈরবী। কর্ম্মকাণ্ডের পরিণাম কিরূপ?

সন্ন্যাসী। কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের মূলভিত্তি। ভক্তির উদয়ে জ্ঞানের বিকাশ। কর্ম্ম প্রাথমিক সূত্র, পরিণতি ভক্তি। কামনা লইয়া ইহা অনুষ্ঠিত হয়, ভক্তির উদয়ে ভগবৎ-প্রেমাধিক্য ঘটে। প্রেম-তরঙ্গে প্লাবিত হইলে তিনি ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না—নিষ্কাম ভাব সমুপস্থিত হয়, তাহা কৈবল্য—পরমা মুক্তি। তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে—ভক্তি দেখা দিয়াছে। এখন অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতে থাক।

ভৈরবী। আরও একটু খুলিয়া বলুন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, "বৎসে, পূর্ব্বেই আমি তোমাকে শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করাইয়াছি। সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে থাকিবে, অথচ কর্ম্মে অনাসক্ত থাকিতে হইবে। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

"অহঙ্কার বল. দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহ (যোগের প্রতিবন্ধক পদার্থ সংগ্রহ চেষ্টা) পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন।"

শ্রেয়োলাভ সর্ব্বদা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। ত্রিতাপদগ্ধ জীব ভ্রাম্যমান জগতের বিষম আবর্ত্তে পতিত হইয়া নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। এই অবশ্যম্ভাবী উত্থান পতন, এই অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন রোধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। শক্তি এখানে প্রতিহত, কর্ম্মণ্যতা রুদ্ধ, উদ্যম প্রয়াস বিফলীকৃত। যতদিন

ভূমণ্ডলে বাস করিতে হইবে, পাঞ্চভৌতিক দেহের অভিমান হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইতে থাকিবে, অহংকারের পরিস্ফুট ভাব জাগ্রত থাকিবে, ততদিন ক্রিয়াশীল পৃথিবীতে ক্রিয় হইয়া বাস করিতে হইবে। ইহাই প্রাকৃতিক সনাতন বিধান, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

ভৈরবী। সে কিরূপ?

সন্ন্যাসী। কর্ম্মবীর পার্থ ভ্রান্তিবশে ইহার বৈপরীত্য সাধন করিতে গিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে—রণাঙ্গণে—উপস্থিত হইয়া মায়াবশে তাঁহার মোহ ঘটিয়াছিল। তাই বিবেকবিমূঢ়ের ন্যায় তিনি বলিয়াছিলেন—

"স্বজন বিনাশ করিয়া জয়লাভ অপেক্ষা হিংসাদি-পাপপরিশূন্য ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ; আর জয়লাভ যে হইবেই, তাহারই বা স্থিরতা কি? পরন্তু জয়লাভ হইলেও ত কষ্টই কেবল। সুতরাং জ্ঞাতি, গুরু, বন্ধু বধ করিয়া কি ফল? যাঁহাদের মৃত্যুতে নিজের বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে না, তাঁহারাই সম্মুখে সংগ্রামার্থ উপস্থিত। অতএব যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, ভিক্ষান্নই শ্রেয়স্কর ও গৌরবের কারণ।"

যখন তৃতীয় পাণ্ডব বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান হইয়া এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াও মোহাভিভূত হইয়াছিলেন, তখন অন্যের কথা কি? অনেকেই বলেন, এই সংসারে আসিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে নিষ্ক্রিয়ভাবে দিনাতিপাত করিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত, এই ধরাধামে কোন বস্তুই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। জড়ের পর্য্যন্ত ক্রিয়া আছে। প্রতিমুহূর্ত্তে অলক্ষ্যে উহার অবস্থান্তর

ঘটিতেছে। মহাভারতের সূত্রপাত অর্জ্জুনের এই নিষ্ক্রিয়াবস্থা, এই নীরবতা, এই তুষ্ণীভাবালম্বন হইতেই। মহাভারতে জীবের সাধনার পথই পরিব্যক্ত হইয়াছে। মহাভারতে গাণ্ডীবী শিষ্য, হৃষীকেশ গুরু। এমন অপরূপ গুরু শিষ্যের সমাবেশ প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না।

যাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত, তাঁহারাই পরিবর্ত্তন-নিয়ম (Law of evolution) পরিজ্ঞাত। এই নিয়মে সমগ্র জৈবিক জগত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গীতাতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বুদ্ধির দোষে, বুঝিবার ভুলে আমরা ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর ভক্তি ও জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে। এই পর্য্যায়ভেদের বৈপরীত্য ঘটাইবার উপায় নাই। মায়া-মোহান্ধ জীব যতক্ষণ চর্ম্মচক্ষে বাহ্যিক জগতের রূপ সন্দর্শন করিবে, ততক্ষণ সে কর্ম্ম করিতে বাধ্য। এই কর্ম্মের প্রসারণে, এই সাধনায়, নেতি নেতি জ্ঞানপ্রভাবে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে—কর্ম্মের সহিত ভক্তি বিকাশোন্মুখ হয়। উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট, পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কর্ম্ম বীজ ভক্তি বৃক্ষ, জ্ঞান চরমবিভূতি বা মোক্ষ ফল। বীজে বৃক্ষ ও ফল সূচিত হইয়া থাকে। আবার বৃক্ষে ও ফলে বীজের পরিণতি পরিদৃশ্যমান হয়। তিনেই এক, একেই তিন—যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। অথচ একের তিন অবস্থান্তর।

তিনেই এক এবং একেই তিন হইলেও অবস্থান্তরজনিত কার্য্যভেদ হইয়াছে। যাহা কর্ম্মকাণ্ডের বিধি, তাহা ভক্তিকাণ্ডের নহে, আবার যাহা ভক্তির পালনীয় কার্য্য, তাহা জ্ঞানের সময়ে

সম্পূর্ণ প্রয়োজ্য নহে। মহাভারতে এই তিন কাণ্ডের ত্রিবিধ ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থূলদর্শী আমরা, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অনেক স্থলে জ্ঞানকাণ্ডের বিধি-নিষেধ কর্ম্মকাণ্ডে অথবা কর্ম্মকাণ্ডের নিয়ম বিধান ভক্তিকাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া, একটা "জগা খিচুরী" করিয়া থাকি। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে, একনিষ্ঠ হইয়া মহাভারতে পাঠ করেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

ভৈরবী। কথাটা আরও একটু বুঝাইয়া বলুন।

সন্ন্যাসী। কর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি প্রথমাবস্থায় সর্ব্বদা প্রক্ষিপ্ত থাকে। চাঞ্চল্য তাহার প্রধান লক্ষণ। এই চঞ্চলতানিবন্ধন চিত্তে পরমাত্মার বিকাশ উপলব্ধি হয় না। আবিলতাপূর্ণ বায়ুবিক্ষোভিত সলিলে যেরূপ চন্দ্রবিম্ব ছিন্নভিন্নাবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়, কর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধিপ্রযুক্ত পরমাত্মার স্বরূপ তদ্রূপ প্রতীয়-মান হয় না। এই কর্ম্মের আবার পর্য্যায়ভেদ অ'ছে। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মভেদে চিত্তের স্থৈর্য্যাস্থৈর্য্য নিরূপিত হইয়া থাকে। যাহার কর্ম্ম সম্পূর্ণ সাত্বিক ভাব-সম্পন্ন, তাহার চিত্ত একান্ত প্রশান্তভাবাত্মক। সাত্বিকতার মাত্রা যেরূপ হ্রাস হইবে, চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা তদ্রূপ প্রকাশ-মান হইবে। রাজসিকভাবে চিত্ত যেরূপ অস্থির হয়, তামসিক কার্য্যে ততোধিক চঞ্চল ও মলিন হইয়া থাকে। এই চিত্তের স্থৈর্য্যতা সম্পাদনার্থ যোগের আবশ্যকতা। চিত্তবৃত্তি নিরোধই কর্ম্মযোগের চরম ফল।

ভৈরবী। এই অভীপ্সিত চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ মহাফল কিরূপে লাভ হইতে পারে?

সন্ন্যাসী। প্রথমে সাত্ত্বিকী বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ইহার নিমিত্তই আর্য্য ঋষি মনিষিগণ প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য, দশ সংস্কার—বার ব্রতাদি পালন, দেবার্চ্চনা প্রভৃতির—ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের ধ্যান ধারণার উপযুক্ত একটা অবলম্বনের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। সেই আরাধ্য বস্তু যদি একেবারে নিরাকার হয়, তাহা হইলে চিত্তের তদবলম্বনে বিরক্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। তাই রূপের কল্পনা ও সৃষ্টি। রূপ আবার এমন হওয়া চাই, যাহার সহিত নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক উভয় ভাবই সংমিশ্রিত থাকে। হিন্দুর প্রতিমাপূজা, বার ব্রত, শ্রাদ্ধাদি, বিবাহাদি সমস্তই এই ভাবদ্যোতক। উহা হইতেই আধ্যাত্মিকতা সূচিত হইয়া থাকে। এই ভাব ক্রমে পুষ্ট হইয়া ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে। তোমাকেও তাই প্রথমে সকাম কর্ম্মের সাধনা করিতে হইতেছে। এই সকাম ক্রিয়াযোগের সাধনায় নিষ্কাম ভাব উদ্বুদ্ধ হইবে। তুমি এখন যেরূপ কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছ, তাহাই অকাতরে পালন করিয়া যাও। সংশয়, উদ্বেগ প্রভৃতিকে হৃদয়ে স্থান দিও না।

ভৈরবী। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। বুদ্ধিহীনতা অথবা প্রগল্ভতার জন্য যদি অপরাধিনী হইয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন।

ভৈরবী আর কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে দীপ্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণান্তর ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

(১)

আজি সূর্য্যগ্রহণ। হিন্দুর আজি পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে লোকারণ্য। গঙ্গাতীরে লক্ষ লক্ষ নরনারী গ্রহণান্তে স্নানদানাদি করিতেছে। কাশীতে অগণ্য ঘাট। ঘাটের সোপানাবলী বহু—সুতরাং ঘাটগুলি অত্যুচ্চ। পিপীলিকার সারির ন্যায় লোকে গঙ্গাস্নানে আসিতেছে। কেহ স্নানার্থে আগমন করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ জপ করিতেছে, কেহ হোম করিতেছে, কেহ দান করিতেছে, কেহ পূজাদি সমাপনান্তে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সকলের মুখেই বিশ্বেশ্বরের নাম। ভগবৎ নামে আজি বারাণসীধাম মুখরিত। সে আনন্দরোল, সে পবিত্র ভাবলহরী, সে জনপ্রবাহ যে দেখিয়াছে, সে ইহজীবনে কখন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

এই নানা দিগ্দেশাগত নানাবর্ণ ও আশ্রমাবলম্বী জনস্রোতের মধ্যে আমাদিগের পূর্ব্বকথিত ভৈরবী যাইতেছেন। তাঁহার রূপের ছটা চারিদিকে যেন বিকীর্ণ হইতেছে। সমীরণ কুন্তলদাম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। নিতম্বচুম্বিত আলুলায়িত কেশভারে দেহযষ্টি যেন অবনতপ্রায়। মুখকমলের উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সেই পথেই লোকে মুগ্ধনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ভৈরবীর কিন্তু তৎপ্রতি দৃক্পাত নাই। তিনি আপন মনে গন্তব্য পথে চলিয়াছেন।

ক্রমে তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভানুকরতাপে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত। ভৈরবী বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

সংসারে নানা প্রকৃতির লোক বাস করে। সুন্দরী কামিনী দেখিলে কাহারও মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, কাহারও হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তিনিচয় মত্ত মাতঙ্গবৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রাগুক্তা ভৈরবী সন্দর্শনে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? ভৈরবীর কিন্তু এ সকলের প্রতি লক্ষ্য নাই। তিনি সেই জনতার মধ্যে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, তাঁহার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, কেহ বা মাতৃসম্বোধনে চিত্তের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতেছেন. কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। যাহাকে তিনি চাহিতেছেন, যাহার অন্বেষণে তিনি ব্যস্ত, তাঁহাকে কোথাও পাইতেছেন না।

অবশেষে এক পাগল তথায় উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে। কতিপয় বালক হাততালি দিতে দিতে "হরি হরি" বলিতেছে। উন্মাদও "হরি হরি" বলিয়া নাচিতেছে। তাঁহার কেশ দীর্ঘ ও রুক্ষ, বসন আর্দ্র, মুখমণ্ডল শুষ্ক ও শ্মশ্রুবিমণ্ডিত। ভৈরবী এই বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া একবার শিহরিয়া উঠিলেন। একবার তাঁহার চিত্ত যেন সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া উত্তমরূপে পাগলকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভৈরবী কিয়ৎক্ষণ পর ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে যেন চিনিতে পারিলেন। তাঁহার আস্যে হর্ষের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি পাগলের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন "করুণাময় বাবু! এ কি!"

করুণাময় নামোচ্চারণে পাগলের যেন বহুকালের সুষুপ্ত স্মৃতি একবার জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, ভৈরবীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর আবার 'হরি হরি' বলিয়া নাচিয়া উঠিলেন। ভৈরবী বলিলেন, "আমাকে চিনিতে পারিলেন না ?"

পাগল কিয়ৎক্ষণ যেন অর্থশূন্য দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে চাহিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মুখেই দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দেখিয়াই স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় করুণাময়কে সমভিব্যাহারে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যখন জপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে করুণাময় পলায়ন করেন। করুণাময়কে কাশীর অনেক বালক চিনিত। দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ সপরিবারে করুণাময়ের রোগের প্রতিকারার্থ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি কাশীতে একমাস যাবৎ অবস্থান করিতেছেন। গ্রহণ. উপলক্ষে স্নান করিয়া কাশী ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প ছিল। তীর্থ পরিভ্রমণে ও নানারূপ সেবা শুশ্রূষায় করুণাময়ের মস্তিষ্কের বিকৃত ভাবের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। করুণাময় সুযোগ পাইলেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। তাঁহার মুখে কেবল "হরি হরি" শব্দই শুনা যাইত। তিনি পথে "হরি হরি" বলিয়া নৃত্য করিতেন, পথের বালকেরাও তাঁহাকে দেখিয়া এইরূপ করিত। বালকদিগের প্রকৃতিই এইরূপ। লোকে যাহা বলিলে ক্ষিপ্ত হয়, তাহারা তাহাই বলিয়া অনেক সময়ে অনেককে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। কিন্তু বালকদিগের ঐরূপ ব্যবহারে করুণাময় রুষ্ট হইতেন না, বরং তুষ্টই হইতেন।

স্মৃতিতীর্থ জপ সমাপ্ত করিয়া দেখিলেন, করুণাময় অন্তর্ধান হইয়াছেন। তিনি শশব্যস্তে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাগলের সন্ধান পাইতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইল না। তিনি করুণাময়কে দেখিয়াই তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক বাসায় লইয়া গেলেন। করুণাময়ও আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

ভৈরবীও পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। বাসায় আসিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পদপ্রক্ষালনান্তর গৃহিণীকে করুণাময়ের কথা বলিতেছিলেন, এমন সময়ে ভৈরবী উপস্থিত হইলেন। রূপসী যুবতীকে ভৈরবীবেশে সমাগতা দেখিয়া স্মৃতিতীর্থ ও তদীয় ব্রাহ্মণী প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ভৈরবী স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমাকে আপনারা কখন দেখেন নাই। কাজেই একেবারে বাড়ীর ভিতর আসায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। হইবারই কথা। আমি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছি।"

স্মৃতিতীর্থ। আপনার আগমনে আমরা ধন্য হইলাম। এক্ষণে বলুন, আমাদিগকে কি করিতে হইবে?

এই সময়ে হিরণ্ময়ীও সেই স্থানে আগমন করিল। ভৈরবী বলিলেন, "একটু বসিতে দিউন। বাবা, এটী কি আপনার কন্যা?"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে পিতৃসম্বোধন করায় তিনি একেবারে গলিয়া গেলেন। বলিলেন, "হাঁ মা, এটী আমার এক-মাত্র কন্যা।"

ভৈরবী। আর ঐ পাগলটী?

স্মৃতিতীর্থ। সে অনেক কথা।

ভৈরবী। বলিতে আপত্তি না থাকিলে বলুন।

স্মৃতিতীর্থ। সে সময় এখন নহে। মা, তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমায় আহার হয় নাই। সত্য কি?

ভৈরবী অবনত তুণ্ডে বলিলেন, "হাঁ বাবা।"

স্মৃতিতীর্থ। তবে এখানেই মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপন কর। আমরা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, বোধ হয়, আপত্তি হইবে না।

ভৈরবী। মা আমার স্বয়ং অন্নপূর্ণা। আপনার বাড়ীতে খাইতে আপত্তি কি হইতে পারে?

স্মৃতিতীর্থ সন্তুষ্ট হইলেন। সকলের আহারাদির পর করুণাময় সংক্রান্ত সকল কথা স্মৃতিতীর্থ বলিলেন। ভৈরবীও করুণাময়ের পরিচয় প্রদানে ক্ষান্ত হইলেন না। ভৈরবী কিন্তু নিজের পরিচয় কিছুই দিলেন না।

তখন একটা আনন্দ প্রবাহ ছুটিল। স্মৃতিতীর্থ বলিলেন, "তবে আজই আমাদের বৈদ্যনাথ যাত্রা করা উচিত।"

সেই মত কার্য্যও হইল। সকলেই বৈদ্যনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(২)

যোগানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘায়ত লোচন, উন্নত নাসিকা, সুন্দর মুখাবয়ব কেবল যে সৌন্দর্য্যপ্রকাশক, তাহা নহে, তেজব্যঞ্জকও বটে! সুন্দর আস্যে দীর্ঘ শশ্রু বিরাজিত। মস্তকের জটাভার পৃষ্ঠ ও অংশোপরি বিন্যস্ত। দেখিলেই প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়।

যোগানন্দ স্বামী কয়েক মাস যাবৎ তপোবনে এক গুহায় বাস করিতেছিলেন। প্রত্যহ বহুলোক তাঁহার দর্শনার্থ তপোবনে উপস্থিত হইত। তিনিও আদর আপ্যায়নে সকলকে সন্তুষ্ট

করিতেন। এই দর্শকশ্রেণীর মধ্যে মনোহর বাবু অন্যতম। মনোহর বাবু প্রত্যহই তাঁহার নিকট আসিতেন। শাস্ত্রকথা আলাপনে উভয়ে অনেক সময় যাপন করিতেন। ক্রমে ক্রমে যোগানন্দ স্বামীর প্রতি মনোহর বাবুর ভক্তি শ্রদ্ধা এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহাকে গুরুবৎ মানিতে লাগিলেন।

একদা মনোহর বাবু ও স্বামীজী একত্রে বসিয়া নানারূপ ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, এরূপ সময়ে ভৈরবী অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভৈরবীকে দেখিয়াই মনোহর বাবু একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন। যেন মুখখানি পরিচিত, যেন কোথাও তাহাকে দেখিয়াছেন। মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলেন, তিনি যাহাকে অনুমান করিতেছেন, সে এ বেশধারিণী হইবে কেন? কেমন করিয়াই বা হইবে? সুতরাং তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক, একবার তাহাই সিদ্ধান্ত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের সংশয় উপস্থিত হইল।

ভৈরবী স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। ভৈরবী যে মনোহর বাবুকে চিনেন, তাহার কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। সন্ন্যাসী ভৈরবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "সংবাদ মঙ্গল ত?"

ভৈরবী। আপনার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সমস্তই কুশল!

এই সময়ে মনোহর বাবু স্বামীজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন স্বামীজী ভৈরবীর প্রমুখাৎ করুণাময়ের সাক্ষাৎলাভ, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সপরিবারে বৈদনাথে আগমন প্রভৃতি সকল কথাই শুনিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যে তাঁহার দর্শনার্থ উৎগ্রীব, ভৈরবী তদুল্লেখ করিতেও বিস্মৃত হইলেন না।

স্বামীজী স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে আনয়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। যোগানন্দ সম্বন্ধে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অনেক কথাই ভৈরবীর নিকট শুনিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সোৎসুক চিত্তে স্বামীজীর দর্শনার্থ আগমন করিলেন।

পরস্পর বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপ করিবার পর স্বামীজী করুণাময়ের বৃত্তান্ত স্মৃতিতীর্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই বলিলেন। কেমন করিয়া ঘাটে নৌকা লাগিয়াছিল, কিরূপ অবস্থায় নৌকাভ্যন্তরে তিনি করুণাময়কে দেখিতে পান, পুলিস কিরূপ উৎপাত করে, সিবিল সার্জ্জন কিরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, ক্ষত আরোগ্য হইলে চিত্তবিকারের জন্য পুলিশ তদন্ত সম্বন্ধে কিরূপ হতাশ হইয়া করুণাময়কে অব্যাহতি প্রদান করেন, করুণাময়ের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা সন্দর্শন করিয়া তিনি তীর্থপর্য্যটনের আবশ্যকতা কিরূপ অনুভব করেন, নানা তীর্থ দর্শনান্তর কাশীধামে আগমন ও ভৈরবীর সহিত সাক্ষাৎ কিরূপে হয়, সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মৃতিতীর্থ মহোদয় স্বামীজী সকাশে বিবৃত করিলেন। স্বামীজী নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাসায় গমন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সানন্দে ভৈরবী ও স্বামীজীকে স্বীয় বাসায় আনয়ন করিলেন।

করুণাময়ের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইবামাত্র করুণাময়ের উন্মত্ততা যেন হ্রাস পাইল। সেই চিত্তচাঞ্চল্য, সেই মস্তিষ্কবিকারের প্রাবল্য, যেন কিছু প্রশমিত হইল। স্বামীজী একদৃষ্টে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে বলিলেন, "দুর্দ্দৈববশতঃ ইহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত

হইয়াছে। আমার বোধ হয়, উপযুক্ত চিকিৎসায় সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে। আমিই ইহার চিকিৎসা করিব।”

স্বামীজীর বাক্যে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও তদীয় পরিবারবর্গের আনন্দের সীমা রহিল না। ভৈরবীও নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। হিরণ্ময়ীর বিষাদমাখা মুখখানিতে আশা ও আনন্দের ছটা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

করুণাময়ের কথা যাহাতে মনোহর বাবু অকস্মাৎ জানিতে না পারেন, তজ্জন্য স্বামীজী সকলকেই সাবধান করিয়া দিলেন।

স্বামীজী চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে করুণাময় ক্রমশঃ প্রকৃতস্থ হইতে লাগিলেন। মনোহর বাবু কিন্তু ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

স্বামীজীর নিকট স্মৃতিতীর্থ ও মনোহর বাবু প্রায়ই আগমন করিতেন। ভৈরবী স্মৃতিতীর্থের বাসাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহার সহিত মনোহর বাবুর সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু স্বামীজীর নিকট সেই এক দিবস ভৈরবীকে দেখিয়া অবধি মনোহর বাবু ভৈরবী সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছিলেন।

এক দিবস মনোহর বাবু স্বামীজীর নিকট বসিয়া নানারূপ কথোপকথনে ব্যাপৃত আছেন, এরূপ সময়ে করুণাময়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতা-পুত্রের চারি চক্ষের মিলন হইল। করুণাময় দৌড়াইয়া গিয়া পিতার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। মনোহর বাবুর মুখে আর বাক্য সরিল না। কেবল নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। কেবল একবার স্বামীজীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, একবার

স্মৃতিতীর্থের মুখের দিকে চাহেন, আর একবার ভূলুণ্ঠিত হারানিধির প্রতি নিরীক্ষণ করেন। বহুদিনের রুদ্ধ ভাব আজি উন্মুক্ত হইয়া ছুটিল। সে ভাবপ্রবাহে মনোহর বাবু স্বয়ং আত্মহারা হইলেন। এক একবার ভাবেন, ইহা কি স্বপ্ন, না প্রহেলিকা? যাহার জন্য তিনি অতুলঐশ্বর্য্যত্যাগী সংসারবিরাগী, যাহার বিরহ-শেল তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, যাহার জন্য সাবিত্রী কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য প্রাণসমা দুহিতার সংবাদও তিনি রাখেন না, সেই স্নেহের উৎস, জীবনের সম্বল, প্রিয়তম পুত্রের মুখকমল এতদিন পরে তিনি যে আবার অবলোকন করিতে পাইবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। কাহার কৃপায়, কাহার করুণায় তিনি এ নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন? স্বামীজীর?—না স্মৃতিতীর্থের?—না ভৈরবীর? এই সকল ভাব প্রবলবেগে তাহার হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর প্রিয় পুত্রকে বুকে তুলিয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। যেন কতদিনের দাবানল—যেন কতকালের পাদপশূণ্য উত্তপ্ত বালুকারাশীপূর্ণ ভীষণ মরুভূমি অমৃতসেচনে শীতল হইল! তখনও তিনি নির্ব্বাক, কেবল আনন্দাশ্রুই পতিত হইতেছিল। তিনি বারংবার হারানিধির মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। সে এক স্বর্গীয় ভাব—অপূর্ব্ব দৃশ্য। সকলেই আনন্দে বিহ্বল। এতদিন পরে—বিরহ-নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের অবসান হইল—পিতাপুত্রের সুখসম্মিলন ঘটিল! পিতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়, পুত্রের ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ প্রাণ আজি পুলকে বিভোর হইয়া উঠিল। প্রেমের বন্যা ছুটিল। সে তরঙ্গে সমস্ত দুঃখ দৈন্য, বিরহ সন্তাপ যেন কোথায় ভাসিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ের ভাবাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তখন মনোহর বাবু করুণাময়ের নিরুদ্দেশ হওয়ায় পরবর্ত্তী ঘটনাবলী শুনিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীজীর কৃপায় পুনরায় হৃদয়-রত্নকে প্রাপ্ত হইয়াছেন অবগত হইয়া স্বামীজীর চরণধূলি বারংবার মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। হায়, এ সময়ে সাবিত্রী কোথায়? পুত্রবিরহসন্তপ্তা দুঃখিনী সাবিত্রী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যদি জানিতে পারিতেন, আবার অঞ্চলের নিধিকে প্রাপ্ত হইবেন, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাণটাকে দেহপিঞ্জরে কোনরূপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। মনোহর বাবুর সে কথা মনে হইল। এই আনন্দের দিনে সাবিত্রীর বিয়োগজনিত যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

যাঁহার যত্ন ও শুশ্রূষায় করুণাময় জীবনলাভ করিয়াছেন, সেই স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে মনোহর বাবু সাদর আলিঙ্গন করিতে ভুলিলেন না। চক্ষের ভাব—নির্ব্বাক ভাষা—অনেক সময়ে প্রাণের কথা—প্রকৃত মনের গাঁথা অধিকতর পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করে। এখানে তাহাই হইল। মনোহর বাবু মুখের কথায় যাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখের ভাবে তাহা উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে যেন কৃতজ্ঞতার উৎস ছুটিতে লাগিল।

প্রথম ভাবাবেগ প্রশমিত হইলে সকলে মিলিয়া বেলেডাঙ্গার গমনের নিমিত্ত পরামর্শ করিলেন। মনোহর বাবুর সানুনয় অনুরোধে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সপরিবারে যাইতে সম্মত হইলেন। স্বামীজী ও ভৈরবীও গমন সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

(১)

গোপীনাথ হাজতে। তাহার পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বির করিবার লোক নাই। পক্ষান্তরে রামধন বাবুর ধনজনের অভাব নাই। কেবল ইহাই নহে। গোপীনাথের পরিবারবর্গের উপর পীড়ন করিতেও রামধন বাবু বিরত হন নাই।

গোপীনাথের বিচার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইয়া গিয়াছে। গোপীনাথের সহিত যে সকল পাইক ও বাহক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষ্য দিল যে, গোপীনাথের পরামর্শানুসারে দস্যুতার একটা ভাণমাত্র হইয়াছিল, তথাকথিত দস্যুগণ গোপীনাথের অনুগত লোক। অর্থাপহরণ গোপীনাথের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধকরণোপলক্ষে তাহারা গোপীনাথের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া পুরস্কৃতও হইয়াছে।

অপরাধ গুরুতর। কেবল বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থাপহরণ নহে, দস্যুতার ভাণ করাও বটে। ফৌজদারী দণ্ডবিধির যত ধারা আছে, বুঝি সকল ধারায় গোপীনাথ অভিযুক্ত হইলেও রামধনের মনস্কামনা পূর্ণ হইত না। একেই প্রবল প্রমাণ, তদুপরি ধর্ম্মাধিকরণের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবিগণ রামধন বাবুর পক্ষভুক্ত হইয়া সরকারী উকীলের সাহায্য করিতে নিযুক্ত, সুতরাং গোপীনাথের নিস্তার কোথায়? গোপীনাথের অর্থ নাই যে ভাল উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন, লোকবল নাই যে রামধনের ষড়যন্ত্রের রহস্য উদঘাটিত করিয়া দেন। সচরাচর প্রবলের উপর দুর্ব্বলের অত্যাচার যেরূপ হইয়া থাকে, এ ব্যাপারেও তাহাই হইল।

দায়রায় বিচার আরম্ভ হইল। আদালত-প্রকোষ্ঠ লোকে-লোকারণ্য। যাহারা গোপীনাথকে নিরীহ ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত, তাহারাও গোপীনাথের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে অদ্য সন্দেহাকুল। তাহারাও বলিতেছে, "এতটা কি মিথ্যা হইতে পারে ?" আবার কেহ কেহ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিচার দেখিতে আসিয়াছে। যাঁহারা গোপীনাথের অন্তরঙ্গ, তাঁহারা ভগবানের নাম জপিতে জপিতে বিচারালয়ে উপস্থিত। যাহাতে নিরপরাধের দণ্ড না হয়, ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা। আর বিপক্ষ দলের ত কথাই নাই। তাহারা ধুমধাম করিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের আড়ম্বরে মেদিনী যেন কম্পান্বিতা। গোপীনাথের পক্ষীয় কাহাকেও দেখিলেই তাঁহারা নানা প্রকার বিদ্রূপ ও শ্লেষ উক্তি করিতে ত্রুটী করিল না। তাহাদিগের টিটকারী ও আস্ফালনে গোপীনাথের পক্ষে লোকেরা অধিকতর ভীত হইয়া পড়িল। রামধন বাবু সকলকে বলিয়াছিলেন, গোপীনাথের কারাদণ্ডের পর তিনি গোপীনাথের পক্ষে সকল লোককেই গ্রামছাড়া করিবেন।

বেলা এগারটা বাজিবামাত্র দায়রার জজ বাহাদুর বিচারাসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাঁহার আসনপরিগ্রহের পর জুরীরা ও উকীল মোক্তারেরা বসিলেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা আসন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা বসিলেন, বাকী সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীরা আদালতের শান্তি শৃঙ্খলা রাখিতে ব্যস্ত হইলেন।

গোপীনাথ কাঠগড়ায় নীত হইল। তাহার সে চেহারা নাই। কেশ রুক্ষ, চক্ষু কোঠরগত, বদনমণ্ডল চিন্তাপ্রভাবে মলিন। সে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

প্রথমে সরকারী উকীল মহোদয় অভিযোগের বর্ণনা করিলেন। তাহার পর অভিযোগ-সমর্থনযোগ্য প্রমাণাদির উল্লেখ করিলেন। তৎপরে পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতির সাক্ষ্যাদি পরিগৃহীত হইতে লাগিল। প্রথম দিন ইহাতেই কাটিয়া গেল।

* * * *

মনোহর বাবু, করুণাময় প্রভৃতি সকলে অকস্মাৎ বেলেভাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের চক্ষুঃস্থির হইল। বাটীর সে শ্রী নাই, গ্রামের সে অবস্থা নাই। চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া লীলাবতীর অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু একি? একটী প্রকোষ্ঠে ভূতলে একখানি ছিন্ন কন্থার উপর এ কাহার কঙ্কালমূর্ত্তি শায়িত? পার্শ্বে একটী মৃৎপাত্রে একটু জল। মূর্ত্তি সজীব কি মৃত, তাহা সহসা বুঝা যায় না। মনোহর বাবু ও করুণাময় দ্রুতপদে মূর্ত্তি সন্নিধানে গমন করিলেন। হঠাৎ অশনিপতন হইলে লোকে যেরূপ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া থাকে, মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া উভয়ে কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাঙনিস্পত্তি হইল না। সেই বড় সাধের—বড় আদরের—লীলাবতীর এই দশা হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। যাহার সামান্য মস্তকবেদনা হইলে মনোহর বাবু, সাবিত্রী দেবী, করুণাময় প্রভৃতি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতেন, সেই স্নেহের আধার, স্বর্ণলতিকার এ দশা কে করিল? এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর কে আছে যে, এই নিরীহ সরলা বালিকার উপর এইরূপ অকথ্য অত্যাচার করিতে পারে? উভয়ে যেন চৈতন্যহারা হইলেন।

প্রকোষ্ঠমধ্যে পদশব্দ শ্রবণ করিয়াই সেই জীর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তিটী শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, আবার বুঝি কালান্তক যমসদৃশ ভর্ত্তা আসিতেছে—আবার বুঝি নির্ম্মমভাবে প্রহার করিবে। হায়, লীলাবতী! তোমার পরিণাম এরূপ হইবে, কে তাহা জানিত?

মনোহর বাবু লীলাবতীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে লীলার মস্তক অঙ্কে তুলিয়া সজলনেত্রে কাতরস্বরে ডাকিলেন, "মা লীলা, মা তোর অভাগা পিতা আসিয়াছে, একবার চেয়ে দেখ।"

মনোহর বাবুর আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনর্গল অশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সেই তপ্ত আঁখিনীর লীলাবতীর উত্তপ্ত কপোলদেশে পতিত হইল। সে বারি উষ্ণ হইলেও লীলাবতীর মনে হইল, বুঝি হিমানী অপেক্ষা শীতল, অমৃত অপেক্ষাও মধুর। লীলাবতী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মিলন করিল।

লীলা নির্ণিমেষ লোচনে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত, বক্ষঃস্থল দীর্ঘশ্বাসের প্রাবল্যে এক একবার স্ফীত হইতে লাগিল। রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ যেন সেই ক্ষীণ কলেবর হইতে এককালে নির্গত হইতে পারিল না। লীলা কাঁদিল। মুক্তাহারসদৃশ জলকণা ক্রমাগত চক্ষু হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। চেষ্টা করিয়াও সে কথা কহিতে পারিল না। তাহাতে তাহার আরও কষ্ট হইতে লাগিল।

লীলাবতী দেখিল, কেবল জনক নহে, সহোদরও আসিয়াছেন। যে সহোদরের অভাবে সোণার সংসার ছারখার হইয়াছে, যে সহোদরের স্নেহ ও ভালবাসার পরিসীমা ছিল না, সেই অগ্রজ আজি উপস্থিত। তাহার অন্তিম দশা দেখিয়া, তাহার সকরুণ

প্রার্থনায় বুঝি ভগবানের দয়ার উদ্রেক হইয়াছে! তাহাতেই কি এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল? পূর্ব্বের কত কথাই লীলাবতীর স্মৃতিপটে উদয় হইতে লাগিল। লীলাবতী এক্ষণে মাতৃহারা। জননীর জন্য সে কাঁদিয়া আকুল হইল।

করুণাময় লীলাবতীকে দেখিয়া কাঁদিলেন। মনোহর বাবু কাঁদিলেন। গৃহমধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই কাঁদিলেন। সেই রোদন ধ্বনিতে—সেই করুণাত্মক দৃশ্যমধ্যেও কিন্তু যেন একটা শান্তিধারা ছুটিল। ক্রন্দনে হৃদয়-ভার লাঘব হয়, শান্তির প্রস্রবন ছুটে, পবিত্রতার সঞ্চার হয়। এমনই সংসারে দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত!

এইরূপে পরস্পর রোদনের কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রথম আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, মনোহর বাবু স্বামীজী প্রভৃতিকে লীলাবতীর নিকট ডাকাইয়া আনিলেন। রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া স্বামীজী বলিলেন "পীড়া সাংঘাতিক—যক্ষ্মা।" তখনই লীলাবতীকে পর্য্যাঙ্কোপরি সুকোমল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করান হইল। বাটীতে রামধন বাবু ছিলেন না, তিনি গোপীনাথের মোকদ্দমা উপলক্ষে হুগলী গিয়াছেন। অঞ্জনাকুমার মনের সাধে পাপাচারে মত্ত। সে মাঝে মাঝে প্রমত্ত অবস্থায় বাটীতে আসিয়া লীলাবতীর উপর নানারূপ নির্য্যাতন করিত। তাহারই অত্যাচারে স্বর্ণপ্রতিমা মসীবর্ণা হইয়াছে, তাহারই যন্ত্রণায় তাহার জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নির্ব্বাণোন্মুখ। অঞ্জনাকুমারের অত্যাচারের সীমা ছিল না। সে অত্যাচার কঠোরপ্রাণ মানুষে সহ্য করিতে পারে না, লীলাবতীর ন্যায় কোমলস্বভাবা, সরলা বালিকার কথা ত দূরে। প্রহারে, অনাহারে, নানা প্রকার নির্য্যাতনে লীলাবতীর দেহ দিন দিন ক্ষীণ

হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল—কঠিন কাসরোগের লক্ষণ একে একে দেখা দিল। তখন তাহার সেবাই বা কে করে, চিকিৎসাই বা কে করায়। অধিকন্তু তাহার উপর অঞ্জনাকুমারের নিষ্ঠুর ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মনোহর বাবুর আসিবার পূর্ব্ব দিবসেও অঞ্জনাকুমার সেই কঙ্কালসার বালিকাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়াছিল।

* * * *

মনোহর বাবু অঞ্জনাকুমারের অনুসন্ধান করিলেন। শুনিলেন, সে গণিকালয়েই অধিকক্ষণ থাকে। মনোহর বাবু ও করুণাময়ের বেলেডাঙ্গায় প্রত্যাগমনের সংবাদ অঞ্জনাকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন সকল অপরাধের কথা তাহার মনোমধ্যে ক্রমে ক্রমে উদয় হইতে লাগিল। কিরূপ পাশবিক অত্যাচারে সে লীলাবতীকে নিগৃহীত করিয়াছে, কিরূপে তাহার পিতা মনোহর বাবুকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছে, কিরূপে গোপীনাথকে কারারুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র হইয়াছে, সকল কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে মনে করিল, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন সমাগত। সুতরাং বেলেডাঙ্গায় থাকিলে তাহার আর নিস্তার নাই। বেলেডাঙ্গা সত্বর পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বেলেডাঙ্গা কি অমনি ছাড়িয়া যাওয়া যায়? সে যে অবস্থায় বেলেডাঙ্গায় আসিয়াছিল, এখন যে তদপেক্ষা সহস্রগুণে হীনতর অবস্থা হইয়াছে। কেন এমন হইল? কাহার দোষে, কাহার জন্য সে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইল? সকল দোষের মূল কি সরস্বতী নহে? সরস্বতীর প্রেমসাগরে যে যদি হাবুডুবু না খাইত,

সরস্বতী যদি লীলাবতীকে পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার পরামর্শ না দিত, সরস্বতী যদি তাহাকে সুরাসেবনে অভ্যস্ত না করিত, তাহা হইলে তাহার কি এ দশা ঘটিত? তবে সকল পাপের, সকল অপরাধের মূল যে সরস্বতী. তাহাকে কিছু শিক্ষা না দিয়া, সে কিরূপে বেলেডাঙ্গা পরিত্যাগ করিবে? সরস্বতীকে শিক্ষা দিবার জন্য সে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সরস্বতী যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় না। তবে কি সে খুন করার দায়ে পড়িবে? ধরা পড়িলে তাহার ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর তাহাতেই বা সরস্বতীর ত বিশেষ যন্ত্রণাভোগ হইল না। সুতরাং হত্যা অনাবশ্যক। তবে কি করিবে? বেলেডাঙ্গায় যদি সে থাকিতে পারিত, তাহা হইলেও না হয়, লীলাবতীর ন্যায় সরস্বতীকে নানারূপে যন্ত্রণা দিতে পারিত। কিন্তু তাহাও হইবার নহে। অনেক ভাবিয়া অঞ্জনাকুমার স্থির করিল, সরস্বতীকে শাস্তি দিবার প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহার সর্ব্বস্বাপহরণ। সে তাহাই করিবে। কিন্তু আর কালবিলম্ব করিলে চলিবে না। এখনই তাহাকে বেলেডাঙ্গা হইতে পলায়ন করিতে হইবে। ঈশ্বর তাহার সহায়। তাই এ সময়ে সরস্বতী স্থানান্তরে গিয়াছে। এই যে সরস্বতীর চাবি বাহিরে পড়িয়া আছে। এমন সুযোগ ত মানুষের প্রায় ঘটে না। দৈব তাহার প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন। অঞ্জনাকুমার আর কালবিলম্ব করিল না। দ্রুতপদে লৌহ সিন্দুকের নিকট গমন করিল। ক্ষিপ্রহস্তে তাহা উদঘাটন করিল। সরস্বতীর সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া সে চম্পট দিল।

* * * * *

এদিকে মনোহর বাবু অঞ্জনাকুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সরস্বতীর বাটীতে লোক গেল। দেখিল, সরস্বতী শিরে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে এবং অঞ্জনাকুমারের উদ্দেশ্যে নানারূপ কটুভাষা প্রয়োগ করিতেছে। লোক ফিরিয়া আসিয়া মনোহর বাবুকে সকল কথাই বলিল। মনোহর বাবু দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত। কিন্তু পাছে লীলাবতী এ ঘটনা শ্রবণ করিয়া অধিকতর মর্ম্মপীড়িতা হয়, এই আশঙ্কায় তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত যদি কেহ থাকেন, তিনি হয়ত মনে করিতে পারেন, যে স্বামী পশুবৎ আচরণে পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে স্বামীর নিরুদ্দেশ-বার্ত্তায় লীলাবতীর মর্ম্মপীড়া হইবে, এ কিরূপ কথা? আমরা তাঁহাদিগকে আদর্শ হিন্দু রমণী-চরিত্র পাঠ করিতে সানুনয়ে অনুরোধ করি। হিন্দু-মহিলার নিকট পতিই দেবতা, স্বামীই সর্ব্বেসর্ব্বা। ভর্ত্তার দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা ভার্য্যার নাই। এ শিক্ষা বিলুপ্ত হইতেছে বলিয়াই হিন্দু সমাজের শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতন ঘটিতেছে।

(২)

অঞ্জনাকুমার পলাতক। সরস্বতী চৌর্য্যাপরাধে অঞ্জনাকুমারকে অভিযুক্ত করিয়াছে। এদিকে গোপীনাথের মোকদ্দমার কথা শুনিয়া মনোহর বাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি পর দিবস প্রাতে হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বিতীয় দিবস বিচারকালে তিনি বিচারগৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রামধনের মুখ শুকাইল। রামধন বাবু সত্বর তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা বলিলেন "আপনি—কোথা—থেকে—?"

রামধন বাবুকে দেখিয়াই মনোহর বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বাটীতে আসিয়া সকল কথাই শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ক্রোধ তখনই প্রশমিত হইল। স্বামীজীর শিক্ষা-গুণে তিনি চিত্তসংযমের এরূপ অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন "গত কল্য বেলেডাঙ্গায় আসিয়াছি। সেখানেই গোপীনাথের বিপদের কথা শুনিলাম। তাই তাহার উদ্ধারকল্পে আসিয়াছি।"

রামধন। সে কি? সে আমার শত্রু, আপনার সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত। তাহার উপর দয়া প্রকাশ করিলে তাহা অপাত্রে ন্যস্ত হইবে। তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতেই হইবে।

মনোহর। আমি সমস্তই শুনিয়াছি। কাহার দোষ, কাহার গুণ, তাহাও বুঝিয়াছি। তাই গোপীনাথকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আপনি ইচ্ছা করিলে এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার সম্পত্তি, আমি যেরূপ বিবেচনা করিব, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিব। আপনার আর অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।

রামধন। বুঝিলাম আপনিই আমার শত্রু। এতক্ষণ আপনার মান রাখিয়া কথা কহিতেছিলাম, এখন আর তাহা কহিব না। শুন, বেহাই—তোমার সম্পত্তি তোমার নহে—আমার। তোমার একমাত্র পুত্র করুণাময় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া এবং তুমি তোমার একমাত্র জামাতা, আমার পুত্র, অঞ্জনাকুমারকে সর্ব্বাংশে যোগ্য বিবেচনা করিয়া, দানপত্র দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছ। সে দানপত্র মিথ্যা বলিবার উপায় নাই। রেজেষ্টারী পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছ। অতএব তুমি এ মোকদ্দমায় কেহ নহ।

তুমিও যে, রাস্তার মুটেও সে। গোপীনাথের উদ্ধারকল্পে যথাসাধ্য করিতে পার, আমি তাহাতে ভীত নহি।

রামধন বাবুর কথায় মনোহর বাবুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি স্বপ্নেও যাহা ভাবিতে পারেন নাই, রামধন বাবু তাহাই বলিল। একি কথা? সম্বন্ধ নৈকট্য থাকা স্বত্বেও, তাঁহার অর্থে উদরপূর্ত্তি করা স্বত্বেও, রামধন বলে কি? মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, জাল জুয়াচুরী, কিছুতেই রামধন যে পরাঙ্মুখ নহে! যেমন পিতা, তেমনই পুত্র! তিনি স্বহস্তে খাত কাটিয়া কুম্ভীর আনিয়াছেন, কাজেই তাঁহকে ফলভোগ করিতে হইবে।

মনোহর বাবু দেখিলেন, রামধন বাবু তথায় নাই—চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তখন ধীরে ধীরে গোপীনাথের উকীলের নিকট গমন করিলেন। গোপীনাথের উকীল সকল কথা শুনিয়া মনোহর বাবুকে এক নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতে বলিলেন।

মোকদ্দমার শুনানী আরম্ভ হইল। আসামীর পক্ষ হইতে বহিরঙ্গ সাক্ষীদিগকে সামান্যরূপ জেরা করা হইল। তাহার পর পাইক, পাল্কীবেহারাদিগের যখন জেরা আরম্ভ হইল, তখন মনোহর বাবুকে আদালত-গৃহে সমুপস্থিত করা হইল। হঠাৎ মনোহর বাবুকে দেখিয়া শিবিকাবাহক, বরকন্দাজ প্রভৃতির মুখ শুষ্ক হইল। তাহারা বুঝিল, তাহাদিগের অপকার করিবার ক্ষমতা আর রামধনের নাই। যে অর্থলোভে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল, রামধন বাবুর তাহাতে আর হাত নাই। সুতরাং ভয়ে, ভক্তিতে এবং স্বার্থপ্রয়োচনাতেও তাহারা সত্য কথা বলিতে লাগিল। মোকদ্দমার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল। গোপীনাথ কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া দর দর ধারায় চক্ষের জল ফেলিতে

লাগিল। জজ বাহাদুর তখন মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন। সরকারী উকীল স্বয়ং বলিলেন, এরূপ মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর কখন দেখেন নাই। আসামী গোপীনাথ নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ হইল। জজ বাহাদুর তাহাকে মুক্তি দিলেন। গোপীনাথ আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে বিচারগৃহের বহির্ভাগে আসিয়া মনোহর বাবুর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মনোহর বাবু তাহাকে সাদরে উঠাইয়া বিচারালয় ত্যাগ করিলেন। রামধন বাবুকে কিন্তু কেহ আর দেখিতে পাইল না।

(৩)

লীলাবতীর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভৈরবী নিরন্তর তাহার সেবায় নিরত। কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ বৈদ্যের চিকিৎসাধীনে থাকিলেও স্বামীজী লীলাবতীর বিশেষ তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। মনোহর বাবু ও করুণাময়ের যত্ন ও সেবার ক্রটী নাই। কিন্তু তথাপি লীলাবতীর বদন সদাই বিষণ্ণ। চিন্তারাক্ষসী যেন পীড়ার সহায়তায় বদ্ধপরিকর। ভৈরবীর সাহায্যে লীলাবতীর একটী বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভৈরবীকে সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখিত। কাজেই তাহার নিকট অসঙ্কোচে মনোভাব ব্যক্ত করিত। এক দিবস ভৈরবীর আগ্রহাতিশয্যে লীলাবতী অঞ্জনাকুমারের নিরুদ্দেশ-জনিত যে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিল। লীলাবতী এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অঞ্জনাকুমার বা তদীয় জনক-জননীর নিকট সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হয় নাই। পরন্তু তাহাদিগের নির্য্যাতনে অকালে তাহাকে ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে

হইতেছে। কিন্তু তথাপি লীলাবতী পতিপ্রাণা। হিন্দুরমণীর ইহাই বিশেষত্ব। হিন্দুমহিলা এই নিমিত্ত জগতে পূজ্যা—বরণীয়া।

ভৈরবী বলিলেন, "অঞ্জনাকুমারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা চিন্তিত থাক, ইহাতে তোমার রোগ কমিতেছে না। স্বামীর সহিত হিন্দুনারীর কেবল ইহজীবনে যে সম্বন্ধ, তাহা নহে—ইহলোকে ও পরলোকে অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান। তুমি বুদ্ধিমতী, পতিপ্রাণা, সাধ্বীসতী; পাতিব্রত্যের সকল রহস্য বিশেষরূপে অবগত আছ। তবে অঞ্জনাকুমারের বিচ্ছেদে এত কাতর কেন?"

লীলালতী। দিদি, অত কথা আমি জানি না। তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ আমার বোধ হয়, তাঁহার বিপদাশঙ্কা। তিনি যে ভাবে বেলেডাঙ্গা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ত তুমি জান। তিনি যে আর কখন বেলেডাঙ্গায় আসিবেন, তাহা ত বোধ হয় না। দাসী ত তাঁহার হৃদয়ে তিলমাত্র স্থান পায় নাই। দাসীর কথা তাঁহার বোধ হয় ভুলেও মনে হয় না। এ সকল তাঁহার দোষ নহে—দোষ আমার। দিদি, পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় বহু পাপ করিয়াছিলাম, এজন্মে তাই এত শাস্তি ভোগ করিতেছি। নতুবা আমাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিলেন না। কেন? তাঁহার দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি আমার স্বামী, আমি তাঁহার দাসী, এই মাত্রই জানি। উঃ—দিদি—বড় কষ্ট! একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাইলে বোধ হয় আমার অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া যায়।

ভৈরবীর গণ্ডদেশ বহিয়া জল পড়িল। তিনি বলিলেন, "অঞ্জনাকুমারের অনুসন্ধানের ত ক্রটী হইতেছে না। সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।"

লীলা। আচ্ছা দিদি, আমার শ্বশুর মহাশয় কি তাঁহার সংবাদ জানেন না?

ভৈরবী। তোমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার নিজের বাড়ীতে গিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তিনি জানিলেও বোধ হয় সংবাদ দিবেন না। বিশেষতঃ তিনি আবার তোমার পিতার সম্পত্তি গ্রাস করিবার জন্য এক জাল দানপত্র প্রস্তুত করিয়া মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মনোহর বাবুর উপর তাঁহার এক্ষণে বিশেষ বিদ্বেষভাব। সুতরাং সে সূত্রে যে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যাইবে, তাহা ত বিশ্বাস হয় না।

লীলা। দিদি, আমার ভাগ্যদোষেই এ সকল ঘটিতেছে। আমার মনে হয়, বুঝি আমি মরিলে সকল গোলযোগই মিটিয়া যায়। কি কুক্ষণেই যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

ভৈরবী। লীলা, সকলই কর্ম্মফল। কেবল তোমার কর্ম্ম-ফলেই যে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহা মনে করা ঠিক নহে। তোমার সহিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটার সম্বন্ধ আছে। সকলের সমবেত কর্ম্মফলের ইহার পরিণাম। সুতরাং আত্মগ্লানি বৃথা।

লীলা। দিদি, আমার অত বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সুতরাং আমি আমার কথাটুকুই ভাবিয়া থাকি। দিদি, শেষ সময়ে—অন্তিমকালে—তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় করিতে পারিব না কি? বলিয়া দাও—কি করিলে এ পাপের শান্তি হইবে, কি করিলে মরিবার সময় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতে পারিব?

ভৈরবী বুঝিলেন, লীলাবতীর পতিভক্তির, স্বামীপ্রেমের অন্ত নাই। সে ভালবাসা অতুলনীয়,—অপরিসীম। তিনি স্থির

করিয়াছিলেন, যদি সাধ্যায়ত্ত হয়, যদি স্বামীজীর অনুমতি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি একবার অঞ্জনাকুমারের অন্বেষণে বহির্গত হইবেন। তিনি লীলাবতীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "লীলা—বোন্‌টী আমার—হতাশ হইও না। তোমার কাতর প্রার্থনা—তোমার ঐকান্তিকী বাসনা—মঙ্গলময় পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভবিতব্যতার গর্ভে কি আছে, তাহা কে জানে! হয়ত আবার অঞ্জনাকুমারের তুমি দর্শন পাইবে, তোমার রোগ দুঃখ দূর হইবে—আবার তুমি সংসারসুখে ভাসমানা হইবে। কোন বিষয়েই আমাদের কৃতিত্ব নাই। আমরা মনে করি এক, ঘটিয়া উঠে আর। মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। তিনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই।"

এমন সময়ে স্বামীজী, মনোহর বাবু, করুণাময়, গোপীনাথ লীলাবতীকে দেখিতে আসিলেন। ভৈরবী এই সুযোগে অঞ্জনা-কুমারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। মনোহর বাবু বলিলেন, "তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, শীঘ্রই সে আসিবে।"

পাঠক মনে করিবেন না যে মনোহর বাবু মিথ্যা কথা বলিলেন। বস্তুতঃই পুলিশ কর্তৃক অঞ্জনাকুমার ধৃত হইয়াছে। মনোহর বাবু এই সংবাদে দুঃখিত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়া-ছিলেন। তিনিও ইহাই চাহিতেছিলেন। লীলাবতীর পীড়া কঠিন হইলেও স্নেহবশতঃ মনোহর বাবু মনে করিতেন যে, লীলা আরোগ্যলাভ করিবে। তখন অঞ্জনাকুমারের জন্য লীলার মর্ম্মবেদনার অবধি থাকিবে না। কাজেই অঞ্জনাকুমারের উদ্ধারের প্রয়োজন। যে অঞ্জনাকুমারের জন্য তাঁহার সংসার ছারখার হইয়াছে, প্রাণের দুহিতা করাল কালগ্রাসে পতনোন্মুখ

তাঁহার উচ্চ মস্তক অবনত হইয়াছে, সেই অঞ্জনাকুমারকে আবার ক্রোড়ে টানিতে হইবে! এ সকলই লীলাবতীর জন্য। স্নেহের এমনই মহিমা—অপত্যপ্রেমের এমনই বিচিত্র শক্তি!

মনোহর বাবুর কথায় লীলার চক্ষুঃ যেন বিস্ফারিত হইল, বদনমণ্ডলে প্রফুল্লতার চিহ্ন প্রকটিত হইল। তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা কি ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে একবার মনে করিল, কথাটা কি সত্য? তাহার ভাগ্য কি এতই প্রসন্ন হইবে? আবার ভাবিল, তাহার দেবতুল্য পিতা ত কখন মিথ্যা কথা বলেন না। সত্যই তাহার ভাগ্যাকাশে সুখসূর্য্য উদয় হইয়াছে। নতুবা এমন হইবে কেন? নিগ্রহের প্রবল কষাঘাতে যমন সে মুমূর্ষু, একগণ্ডুষ জল দিবার লোকও যখন কাছে ছিল না, তখন তাহার পিতা ভ্রাতা আসিবেন কেন? সংসারে একটা প্রবল ঝটিকা যেন বহিয়া গিয়াছে, সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর প্রকৃতিদেবী আবার যেন প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। এই শান্তির সময় তাহার স্বামিচরণ-দর্শন-লাভ অসম্ভব ব্যাপার না হইতে পারে। লীলা যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল।

অঞ্জনাকুমারের সংবাদ মনোহর বাবুর কিরূপে কর্ণগোচর হইয়াছিল, তিনি তাহা বলিলেন না। সে সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্নও করিল না।

গোপীনাথকে দেখিয়া লীলা একটু লজ্জিতা হইল। অঞ্জনা-কুমারের ব্যবহারের কথা যাহাতে গোপীনাথ মনোহর বাবুর নিকট প্রকাশ না করেন, লীলা সেই ভাবে কাতর নয়নে গোপীনাথের মুখের প্রতি চাহিল। গোপীনাথ তাহা বুঝিল। লীলার লজ্জার আর এক কারণ, রামধন বাবু প্রভৃতির গোপীনাথের প্রতি

অকথ্য কুব্যবহার। লীলা লজ্জাবিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“কাকা, ভাল আছেন ত?”

গোপীনাথ। হাঁ মা, ভাল আছি। এখন তুমি ভাল হ'লেই আমাদের সংসার আবার সুখময় হয়।

লীলা। আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।

গোপীনাথ। মা, আমরা নারায়ণের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যেন সত্বর নিরাময় হও।

লীলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সে বুঝিয়াছিল, তাহার দিন সঙ্কেপ। সে জানিত, স্বামীপ্রেম লাভ তাহার পক্ষে শূণ্যে সৌধনির্ম্মাণসদৃশ। তবে তাহার আর বাঁচিয়া লাভ কি? যে রমণী পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, তাহার মরণই মঙ্গল। লীলা তাই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে, অসহ্য যন্ত্রণার নিদর্শন-স্বরূপ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিল। প্রাণের ভিতরে যে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, উহা তাহারই আভাষমাত্র।

লীলাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত মনোহর বাবু প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। লীলা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে মৌখিক আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর যে অশান্তি বিদ্যমান ছিল, তাহার তিলমাত্র লাঘব হইল না।

(৪)

অঞ্জনাকুমার চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। অভিযোগ গুরুতর—দণ্ডও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা। যদি অঞ্জনার কারাদণ্ড হয়, তাহা হইলে লীলা ত আর বাঁচিবে না। সুতরাং অঞ্জনাকুমারের অব্যাহতির জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা হইতে লাগিল। সরস্বতীকে

সহজেই হস্তগত করা হইল। পুলিশের ত কথাই নাই। মোকদ্দমার ফলে, প্রমাণাভাবে অঞ্জনাকুমার মুক্তি পাইল।

রামধন বাবু জাল দানপত্র উপলক্ষে মোকদ্দমা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন, গোপীনাথের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা করণার্থ তাঁহাকে অভিযুক্ত করিবার উপক্রম হইতেছে, তখন তিনি জাল দানপত্রখানি লইয়া সভয়ে মনোহর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

* * * *

আজি লীলার জীবনের শেষ দিবস। সকলেই রোগিণীর শয্যাপার্শে উপস্থিত। লীলা শীর্ণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক পিতৃপদধূলি মস্তকে ধারণ করিল। ভৈরবী নিকটে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি অঞ্জনাকুমারকে সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। লীলা লজ্জাবনত অথচ সকরুণ দৃষ্টিতে অঞ্জনাকুমারের দিকে চাহিল। যে জন্মের মতন বিদায় লইতেছে, সহস্র ব্রহ্মাণ্ড দিলেও কিয়ৎকালের জন্য যাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, সে আজ মরমের দায়ে ইহজগতের দেবতাকে না দেখিয়া কি মরিতে পারে? লীলা চাহিল—অঞ্জনাকুমারের সহিত চারি চক্ষের সম্মিলন হইল। বিবাহের দিনে একবার হইয়াছিল, আজ আবার হইল। সেই একদিন, আর আজি একদিন। লীলার সজলনের যেন নিমীলিত হইয়া আসিল—দৃষ্টি যেন অপরিস্ফুট হইল—লীলা ভর্ত্তার পদধূলি লইয়া শিরে ও বক্ষে লেপন করিল। মনে হইল, তাহার বুঝি শরীর জুড়াইল। এত যে রোগের যন্ত্রণা, এত যে গাত্রদাহ, স্বামীর পদধূলিপ্রসাদে তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। অন্তিম সময়ে সে যে অঞ্জনাকুমারকে

দেখিতে পাইবে, সে আশা তাহার ছিল না। কিন্তু আজি সেই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে—নৈরাশ্যের ঘোরান্ধকারে আশালোক দেখা দিয়াছে। লীলার বুঝি আজি মরিয়াও সুখ।

লীলা রামধন বাবু প্রভৃতি সকলের পদধূলি লইল। তাহার পর একবার কাসিল, একবার রক্ত বমন করিল—আর অঞ্জনাকুমারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সকলই ফুরাইল। মনোহর বাবুর স্নেহের আধার, সাবিত্রীর অঞ্চলের নিধি, করুণাময়ের আদরের পুতুলি ইহধাম ত্যাগ করিল—সংসারের সকল যন্ত্রণা ভুলিল। আর তাহাকে অঞ্জনাকুমার, রামধন যন্ত্রণা দিতে পারিবে না, আর তাহাকে মাতা পিতা ভ্রাতার বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করিতে হইবে না, আর ইহ জগতের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ তাহার উপর স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। লীলা সতীলক্ষ্মী, তাই মৃত্যুসময়ে স্বামিসন্দর্শনে বঞ্চিতা হইল না। আজ কেবল তাহার জননী ইহধামে নাই—তদ্ব্যতীত আর সকলেই—এ সংসারে যাঁহারা তাহার প্রিয় ও আত্মীয়—মৃত্যু সময়ে উপস্থিত হইল। বিধাতার এমনই লীলা—পতিপ্রাণার এমনই আকর্ষণ, সাধ্বীর এমনই পুণ্য ফল!

লীলা গেল। মনোহর বাবুর সংসার শোকাচ্ছন্ন হইল। যেন বাটীর তৈজসপত্র পর্য্যন্ত বিষাদের ছায়া বুকে লইয়া শোকগাঁথা গাহিতে লাগিল! মনোহর বাবু কাঁদিলেন, করুণাময় কাঁদিলেন, গোপীনাথ কাঁদিল, পাষণ্ড রামধন ও অঞ্জনাকুমারেরও চক্ষুপ্রান্তেও জল দেখা দিল।

প্রথম শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে স্বামীজীর আদেশক্রমে লীলার ঔর্দ্ধদেহিক সমাপনের ব্যবস্থা হইল। যতক্ষণ লীলার

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতেছিল, চিতানল জ্বলিতেছিল, ততক্ষণ ভৈরবী একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়াছিলেন। তাহার পর চিতাগ্নি নিবিল—সকলই ফুরাইল।

স্বামীজী ও ভৈরবী নিকটে থাকায় মনোহর বাবু ও করুণাময়ের শোকভার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। সাহচর্য্যের এমনই প্রভাব। মানুষ যেরূপ সমাজে বাস করে, যেরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করে, যেরূপ বিষয়ের প্রসঙ্গাধীনে থাকে, সেইরূপ ভাবাপন্ন হয়। ইহাই সংস্কার। মনোহর বাবু পূর্ব্ব হইতেই চিত্তসংযম করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার স্বামীজীর সহিত নিত্য তত্ত্বকথা আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায়, মনোভাব বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। করুণাময়েরও তাহাই।

মনোহর বাবুকে আর এক কারণে শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পাছে তাঁহাকে বিমর্ষ দেখিলে করুণাময়ের মস্তিষ্ক পুনর্ব্বার বিকৃত হয়, এই আশঙ্কায় অনেক সময়ে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহা প্রকাশ করিতেন না।

(৫)

লীলার মৃত্যুর পর রামধন বাবু ও অঞ্জনাকুমার কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ বেলেডাঙ্গা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পথে পিতা পুত্রে বচসা হয়। কাহার দোষে তাহাদিগের কপাল ভাঙ্গিল, আশা ভরসা বিলুপ্ত হইল, ইহাই বিবাদের মূলীভূত কারণ। কলহে বিপত্তি ঘটিল। সুরামত্ত অঞ্জনাকুমার ক্রোধের বশে হস্তস্থিত লগুড়দ্বারা পিতার মস্তকে দারুণ আঘাত করিল। রামধন তাহাতেই ভূতলশায়ী হন। প্রচণ্ড লগুড়াঘাতে তিনি মৃতকল্প হইলেন। সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল—অজস্রধারে শোণিত

ছুটিল। অঞ্জনাকুমার ভাবিল, পিতা মরিয়াছে। পাছে পিতৃহন্তা বলিয়া সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এই আশঙ্কায় সে দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। ক্রমে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি পুলিশের লোকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। তাহার নিকট অনেকটা সুরা ছিল, সে তাহার সমস্তটাও গলাধঃকরণ করিল। আবার ছুটিতে লাগিল। সুরা-প্রকোপে ক্রমে সে নেশায় অভিভূত হইল। তাহার তখন পা টলিতেছে—মাথা ঘুরিতেছে। মনে হইতেছে, কেবল পুলিশ নহে— রামধন বাবুর প্রেতমূর্ত্তি পর্য্যন্তও তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। অঞ্জনাকুমার আরও বেগে ছুটিল। মদিরাসক্ত অঞ্জনাকুমারের তখন আর বাহ্যিক জ্ঞান ছিল। সম্মুখেই একটী গভীর পুষ্করিণী ছিল। তাহার পদস্খলন হইল। অমনই সেই গভীর তড়াগে সে পতিত হইল। জলরাশি একবার উছলিয়া উঠিল। কিন্তু সে জনশূন্য স্থানে তাহার পতনের শব্দ কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অঞ্জনার জীবনরঙ্গে এইরূপে যবনিকা নিপতিত হইল।

এদিকে রামধন যখন সংজ্ঞালাভ করিল, তখন দেখিল, জনৈক চৌকীদার তাহার নিকটে উপবিষ্ট। রামধন বাবুকে চৌকীদার নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। তিনি একে একে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। চৌকীদার রামধন বাবুকে নিকটবর্ত্তী ফাঁড়িতে লইয়া গেল। রামধন বাবুর ক্ষত যথাসময়ে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইল। আঘাত গুরুতর হইয়াছিল। এদিকে অঞ্জনাকুমারের নামে গ্রেপ্তারী পরয়ানা বাহির হইল। অনুসন্ধানে পুলিশ প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত পুষ্করিণীতে তাহার মৃতদেহ প্রাপ্ত হয়। রামধন বাবু মৃতদেহ চিনিতে পারিলেন। তখন

পুত্রস্নেহ উথলিয়া উঠিল। দারুণ আঘাতে একেই তিনি বিকলাঙ্গ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পুত্রশোকে জ্ঞানহারা হইলেন। ক্ষামধন বাবুর ক্ষত আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু তিনি আর প্রকৃতিস্থ হইলেন না।

(৬)

লীলাবতী মৃত্যুর পর, শোকবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, মনোহর বাবুর নিকট স্বামীজী করুণাময়ের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্বামীজীকে মনোহর বাবু গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন। স্বামীজী ভৈরবীর প্রমুখাৎ পূর্ব্বেই হিরণ্ময়ীর কথা শুনিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সুতরাং তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাবে কাহারও অমত হইল না—বরং সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। যথাসময়ে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি করুণাময়কে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, কাজেই সাহ্লাদে এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। শুভদিনে, শুভলগ্নে করুণাময় উদ্বাহপাশে আবদ্ধ হইলেন। যে সংসারের বিষাদের ছায়া সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছিল—সেই সংসারে আবার সুখের মধুর আলোক বিকশিত হইল।

বিবাহান্তে একদিন স্বামীজী, মনোহর বাবু, স্মৃতিতীর্থ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করিয়া বলিলেন, "মনোহর, মনে আছে কি কিছু দিবস পূর্ব্বে তুমি আমাকে এই ভৈরবীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তখন আমি বলিয়াছিলাম, যথাসময়ে আমি ইহার পরিচয় দিব। আজ সেই পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মনোহর, তুমি বলিয়াছিলে এই ভৈরবীর আকার প্রকার

অনেকটা তোমাদের গ্রামে রমা বলিয়া একটী ধীবর-কন্যা ছিল, তাহার ন্যায়। তোমার বাড়ীতে ডাকাইতি হইবার পর হইতে সে রমার আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। কেমন না?"

মনোহর বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন "হাঁ।" স্বামীজী এ সংবাদ কিরূপে অবগত হইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

স্বামীজী অনন্তর বলিতে লাগিলেন, "সে দস্যুতার সহিত রমার যে কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। দস্যুরা করুণাময়কে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর রমার কুটীরে উপস্থিত হয়। দস্যুপতি ভৈরব রমার স্বামী। রমার পতিভক্তি অসীম, তথাপি তোমার বাটীতে দস্যুতা হওয়ায় ও করুণাময়কে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ায় রমার মর্ম্মপীড়ার শেষ ছিল না। কিন্তু তাহার প্রতিকার করিবার কোন উপায় ছিল না। ভৈরব তাহাকে ও করুণাময়কে নৌকায় করিয়া লইয়া যায়। যাইবার সময় রমার কুটীরখানি পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দেয়।

"রমা নৌকায় উঠিয়া দেখিল, করুণাময় দারুণ আঘাতে জর্জ্জরিত। তাহার মস্তক হইতে অবিরল ধারায় শোণিত নির্গত হইতেছে—সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। তখনই ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়। রমা প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতে থাকে। এই সময় হইতেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়।

"ইহাতে রমার উপর ভৈরব ক্রুদ্ধ হইতে থাকে। ক্রোধের মূলীভূত কারণ, সন্দেহ। করুণাময়ের ন্যায় সুন্দর যুবার প্রতি রমার এত দয়া কেন? এটা দয়া, না ভালবাসা? ভৈরব রমার চরিত্র বিশেষরূপে অবগত থাকিলেও একেবারে ঈর্ষার হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। তাহার মনে কখন নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত

হইত, আবার কখন সে ভাব তিরোহিত হইত। এইরূপে তাহার হৃদয়মধ্যে বিরুদ্ধভাবনিচয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

"বাল্যকালে ভৈরবের প্রকৃতি অতি মধুর ছিল। সে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে। বিদ্যার্জ্জনের তাহার অমনোযোগিতাও পরিলক্ষিত হইত না। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাহার পিতার সহিত রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তির বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। এই রামানন্দেরই কন্যা রমা। রামানন্দের অন্য পুত্রকন্যা ছিল না—রমাই একমাত্র দুহিতা। সুতরাং রমার চরিত্রগঠন, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির উপর রামানন্দের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বলা বাহুল্য, এই রমার সহিত ভৈরবের বিবাহ হইল।

"বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। রমার অদৃষ্টদোষেই হউক, আর কর্ম্মফলপ্রযুক্তই হউক, ভৈরবের মাতাপিতা ইহধাম ত্যাগ করেন। ভৈরব যখন সংসারে একাকী হইল, তখন সুযোগ পাইয়া তাহার পৈতৃক সম্পত্তি জমিদার গ্রাস করে। ভৈরব পথের ভিখারী হয়। ক্রমে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, স্ত্রীর ভরণপোষণ করাও সুকঠিন হইল।

"এই সময়ে জমিদার ভৈরবের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে এক গুরু অভিযোগ উপস্থিত করে। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও ভৈরবের আত্মরক্ষা করিবার সাধ্য ছিল না। ভৈরব সেই ভয়ে গৃহ ত্যাগ করে।

"ভৈরব নিরুদ্দেশ হইলে রমা পিত্রালয়ে প্রত্যাগত হয়। রমার মাতা রমাকে প্রসব করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রামানন্দ এক মহাপুরুষের দর্শন পায়। তাহারই ফলে সে বৈরাগ্য অবলম্বন করে।

"বাটীতে মথুর নামক এক পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। গত্যন্তর না দেখিয়া মথুর রমাকে বেলেডাঙ্গায় লইয়া যায়। বেলেডাঙ্গায় তাহার পৈতৃক বাস। মথুর বাল্যাবধি রামানন্দের বাটীতে ছিল। বেলেডাঙ্গায় কদাচ আসিত। বেলেডাঙ্গায় তাহার কেহই ছিল না। সুতরাং মথুরের সংবাদ বেলেডাঙ্গার লোকে বড় একটা রাখিত না। বৃদ্ধ মথুর যখন রমাকে লইয়া আসিল, তখন সে রমাকে আপনার কন্যা বলিয়া পরিচিত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রমা ব্রাহ্মণকন্যা। ইহার কয়েক দিন পরেই মথুর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"ভৈরব পুলিশের ভয়ে লোকালয়ে থাকিত না। সে দস্যুতা করিতে আরম্ভ করিল। নতুবা জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ন্তর ছিল না। একে দেশের জমিদারবর্গের উপর রাগ, তাহাতে আবার ঘোরতর দারিদ্র্য,সুতরাং ক্রমেই তাহার নিকট কুপথ সুপথ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে ক্রমে নামজাদা ডাকাত হইল।

"উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণকুমার ভৈরব কর্ম্মবিপাকে পাষাণ-হৃদয় দস্যু হইল বটে, কিন্তু প্রাণাধিকা ভার্য্যাকে ভুলিতে পারিল। রমা তাহার নৈরাশ্যান্ধকারময় জীবনের একমাত্র বিজলীরেখা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট পাপাসক্ত চিত্তে একমাত্র স্বর্গজ্যোতি। তাহাকে কি সে সহসা বিস্মৃত হইতে পারে? তাই সে মাঝে মাঝে অতি সঙ্গোপনে বেলেডাঙ্গায় আসিয়া রমার সহিত দেখা করিত। তাহারই জন্য রমা নিজের গতিবিধি নানাবিধ প্রহেলিকাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভৈরব বেলেডাঙ্গায় গোপনে রমার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিত। ক্রমে বেলেডাঙ্গায় জমিদার বাড়ীর উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। বেলেডাঙ্গার জমীদার বাটী

লুণ্ঠন করিবার বাসনা এইখান হইতেই ভৈরবের উদ্দীপিত হয় সে কিন্তু রমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা খুলিয়া বলে না। কেবল তাহার জনৈক সঙ্গী আসিয়া রমার কুটীরে একরাত্রি অল্পক্ষণের নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহাই রমাকে বলে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে রমা পারিল না। কাজেই ভৈরবের সঙ্গী বেলেডাঙ্গার স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর তোমার বাটীতে ডাকাইতি হয়। এই ডাকাইতিতে ভৈরব ও তাহার সঙ্গী ব্যতীত আর কেহ সংশ্লিষ্ট ছিল না।"

স্বামীজীর কথা শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতবৎ অবস্থান করিয়া শুনিতেছিল। স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নৌকায় করুণাময়ের শুশ্রূষায় রমা নিযুক্ত হওয়ায় ভৈরবের ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হয়। রমা তাহাতে প্রমাদ গণিল। কে জানে, ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া ভৈরব যদি অচৈতন্য করুণাময়ের প্রাণসংহার করে? তখন করুণাময়কে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনে রমা নিযুক্ত হইল। একদিন ভৈরব ও তাহার সঙ্গী নৌকা হইতে আহার্য্য সংগ্রহার্থে গ্রামাভিমুখে গমন করিলে রমা ভগবানকে স্মরণ করিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকাখানি কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতে ভৈরব ও তাহার সঙ্গী প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভৈরব নৌকা ধরিবার জন্য সাঁতার দিতে আরম্ভ করে। সন্তরণপটু ভৈরব অবশেষে নৌকাখানি সন্নিকটবর্ত্তী হয়। তখন ঈর্ষায়, রাগে সে উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। ক্রোধাগ্নি যেন তাহার চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইতেছিল! সে রমাকে তদবস্থায় শ্লেষোক্তি করিতেও ছাড়ে নাই। রমা দেখিল, বিষম বিপদ উপস্থিত। সে ভাবিল, একেই তাহার বুদ্ধির দোষে জমিদার বাটী লুণ্ঠিত

জমিদার পরিবার বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহার উপর যদি আবার ভৈরব নৌকায় উঠিতে পারে, তাহা হইলে করুণাময়ের জীবনের আর আশা থাকিবে না। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রবৎ সে করুণাময়ের নিধন সাধন করিবে। করুণাময়ের জীবনরক্ষাই রমার লক্ষ্য ছিল—নিজের কথা সে আদৌ ভাবে নাই।

"একদিকে প্রেমের টান, অন্যদিকে ব্রাহ্মণকুমারের জীবন-রক্ষা। রমা নিমেষের মধ্যে কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ফেলিল। ভৈরব যাহাতে নৌকায় উঠিতে না পারে, তজ্জন্য সে প্রস্তুত হইল।"

"মানুষ ভাবে এক, হয় আর। নিয়তির শাসন অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। রমা ভাবিয়াছিল, ভৈরব নৌকায় উঠিতে না পারিলে বাধ্য হইয়া কূলে ফিরিবে। কিন্তু তাহা হইল না। নদীগর্ভে কি হইল জানা যায় নাই—সম্ভবতঃ জলজন্তুর আক্রমণে ভৈরব সেই তরঙ্গসলিলা ভাগিরথী বক্ষে অকস্মাৎ নিমজ্জিত হইল। ভৈরব যেথানে ডুবিল, সেখানের জল সামান্য লোহিতাভ হইল। ইহাতেই রমা বুঝিয়াছিল, ভৈরব কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সতীর হৃদয়ে শোকের পাথার উথলিয়া উঠিল, প্রেমের বন্যা ছুটিয়া—বিরহের তপ্তানিল প্রবাহিত হইল। সে ভর্ত্তার অনুগমনাশয়ে নদীবক্ষে ঝাঁপ দিল।

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামানন্দ এক মহাপুরুষের প্রসাদে অমৃত জীবন লাভ করিয়াছিল। সংসারের মায়া মমতা, জ্বালা-যন্ত্রণা তাহাকে আর অভিভূত করিতে পারিত না। সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিল। এই সময়ে সে কার্য্যব্যপদেশে নৌ-যোগে স্থানান্তরে যাইতেছিল। যেখানে রমা ডুবিয়াছিল, ঘটনাক্রমে

তাহারই সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রামানন্দের নৌকা লাগিয়াছিল। একটা মনুষ্যদেহ জাহ্নবী তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া রামানন্দ স্বয়ং নদীতে ঝাঁপ দেয়। দেহটীকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া দেখে, দেহ অন্য কাহারও নয়—তাহার প্রাণের নন্দিনীর। তৎপরে বহু-কষ্টে রমার চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। রমা ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া সকল কথা বলে। তখন রমাকে জগতের সেবা করিতে রামানন্দ নিযুক্ত করেন। সেই রমা এই ভৈরবী। আর সেই রামানন্দ এই অধম সন্ন্যাসী। রমার মুখেই আমি সমস্ত কথা শুনিয়াছি।"

স্বামীজীর বাক্যাবসান হইতে না হইতে সকলেই যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইয়া স্বামীজীর চরণধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বেলেডাঙ্গায় একটা আনন্দের কোলাহল উঠিল। যেখানে রমার কুটীর ছিল, মনোহর বাবু তথায় এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। মন্দিরস্থিত শিবের নাম হইল "ভৈরব"। আর মন্দিরগাত্রে রমার এক তৈলচিত্র বিন্যস্ত হইল—তাহার নিম্নদেশে লেখা ছিল "ভৈরবী"। বহুকাল ধরিয়া বেলেডাঙ্গা পুণ্যময় স্মৃতিচিহ্ন বুকে লইয়া হিন্দু রমনী চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।